শুকতারা

চতুর্বিংশ বর্ষ, একাদশ সংখ্যা, পৌষ: ১৩৭৮

মরণের ডাক!

উপন্যাস

ছোটরা যেখানে....
আমাদের বইও সেখানে

ছোটদের উপন্যাস ছোটদের চরিত্র-গঠনে সাহায্য করবে। এক-একটি বই যেন রত্নের খনি! হাতে পেলে আর ছাড়া যায় না।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের
দুই ভাই -২.০০

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ম্যাণ্ডার কবুতর ২.০০

সুধীন্দ্রনাথ রাহার
মা ভাই বোন ১.৫০

দৃষ্টিহীনের
মা! আমি অশোক ১.২৫

বাছাইকরা গল্প সংকলন

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
গল্প বলে দাদুমণি - ৩.০০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
াদা কালো - ৪.০০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
বহুরূপী - ৩.০০

সুধীন্দ্রনাথ রাহার
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গল্প - ৪.০০
বিদেশী গল্প চয়ন - ৪.০০

আশাপূর্ণা দেবীর
ানো শোনো গল্প শোনো ৩.০০

বিধায়ক ভট্টাচার্যের
শ্রীদুর্গার পলায়ন - ৩.০০

॥ আরও অনেক বই ॥
বিস্তারিত তালিকার জন্য চিঠি লিখুন।

বাঁটুল দি গ্রেট

আমার জন্যে একটা হাত ঘড়ি কিনবো রে লম্বু! কোত্থেকে কিনি বলতো?
বেশতো চলো, আমার জানা ভালো দোকান আছে!
বাঁটুলদাকে বেশ ভালো একটা হাতঘড়ি দিন দেখি দাদা!
হ্যাঁ হ্যাঁ! নিশ্চয়ই! বেশ ভালো ঘড়িয়া আছে তাই দিচ্ছি।
খুব ভালো ঘড়ি দিলুম। পাঁচ বছরের গ্যারান্টি। এর মধ্যে ঘড়ির কিছু হবে না।
ভালো ঘড়ির জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ!
দুঃখিত! এটা ইচ্ছাকৃত নয়। স্প্রীং চাপড়ের প্রেসারটা কিঞ্চিৎ বেশী হওয়াতে এটা হয়েছে।
চটাস্!
একি! ঘড়ি যে ভেঙে গেছে! আর বললেন যে পাঁচ বছরে কিছু হবে না!
ঠিক আছে, আর একটা ঘড়ি দিচ্ছি। এটারও পাঁচ বছরের গ্যারান্টি। কিন্তু দয়া করে এবার আর আমাকে ধন্যবাদ দিতে যেওনা!
এঃ! ঘড়িটার সময়টা ঠিক করে দিতে ভুলে গেছে। ফিরে গিয়ে সময়টা ঠিক করে নিয়ে আসি।
দোকানদার নেই দেখছি। কাউন্টারে হাত ঠুকে আমাদের উপস্থিতিটা জানিয়ে দি। এই যাঃ! আবার ঘড়িটা ফেটে গেল!

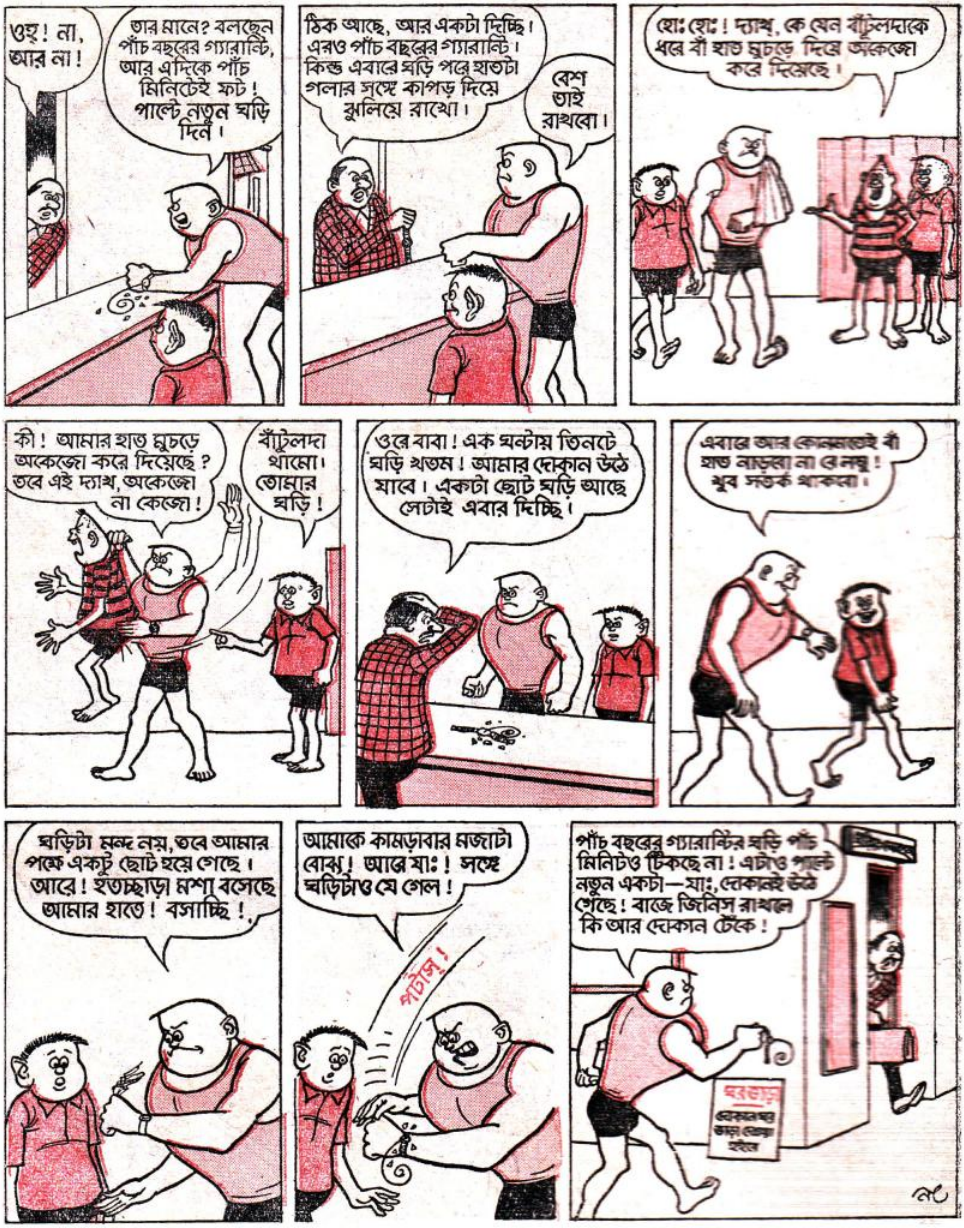
ওহ্! না, আর না!
তার মানে? বলছেন পাঁচ বছরের গ্যারান্টি, আর এদিকে পাঁচ মিনিটেই ফট! পাল্টে নতুন ঘড়ি দিন।
ঠিক আছে, আর একটা দিচ্ছি। এরও পাঁচ বছরের গ্যারান্টি। কিন্তু এবারে ঘড়ি পরে হাতটা গলার সঙ্গে কাপড় দিয়ে ঝুলিয়ে রাখো।
বেশ তাই রাখবো।
হোঃ হোঃ! দ্যাখ্, কে যেন বাঁটুলদাকে ধরে বাঁ হাত মুচড়ে দিয়ে অকেজো করে দিয়েছে।
কী! আমার হাত মুচড়ে অকেজো করে দিয়েছে? তবে এই দ্যাখ, অকেজো না কেজো!
বাঁটুলদা থামো। তোমার ঘড়ি!
ওরে বাবা! এক ঘন্টায় তিনটে ঘড়ি খতম! আমার দোকান উঠে যাবে। একটা ছোট ঘড়ি আছে সেটাই এবার দিচ্ছি।
এবারে আর কোনমতেই বাঁ হাত নাড়বো না ও নড়ু! খুব সতর্ক থাকবো।
ঘড়িটা মন্দ নয়, তবে আমার পক্ষে একটু ছোট হয়ে গেছে। আরে! হতচ্ছাড়া মশা বসেছে আমার হাতে! বসাচ্ছি!
আমাকে কামড়াবার মজাটা বোঝ্! আরে যাঃ! সঙ্গে ঘড়িটাও যে গেল!
স্যাটাস্!
পাঁচ বছরের গ্যারান্টির ঘড়ি পাঁচ মিনিটও টিকছে না! এটাও পাল্টে নতুন একটা—যাঃ, দোকানই উঠে গেছে! বাজে জিনিস রাখলে কি আর দোকান টেঁকে!
ঘরভাড়া

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine vide No. 321 (9)-T. B. C.

(Dated 14th August, 1971. 2B-20G/71)

সূচীপত্র—পৌষ, ১৩৭৮

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	মরণের ডাক	তুষার চ্যাটার্জী ...	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট	নারায়ণ দেবনাথ ...	প্রথম ছবি
৩।	উলটো আদর (কবিতা)	শ্রীঅশোক সী ...	৭৭৯
৪।	পাণ্ডব গোয়েন্দা (গল্প) ...	ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় ...	৭৮০
৫।	কি রকম দেখতে : চিকাগোর বিমান বন্দর (জানবার কথা) ...	— ...	৭৯০
৬।	কাপুর সিং ও দল-খালসা (অমর বীর কাহিনী)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার ...	৭৯১
৭।	এই ছবিটির মধ্যে কি কি জিনিস লুকিয়ে আছে বলতে পার ? (মজার ছবি) ...	— ...	৭৯৭
৮।	ইচ্ছামতী চুণী (বিদেশী উপকথা) ...	অনিমা দে ...	৭৯৮
৯	আগন্তুক (ছবিতে গল্প) ...	ময়ূখ চৌধুরী ...	৮০২
১০।	চোর (গল্প) ...	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা ...	৮০৪
১১।	কাশেল উধম সিং (শহীদ স্মৃতিকথা)	রঞ্জন মিত্র ...	৮১১
১২।	৭৯৭ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর ...	— ...	৮১৬
১৩।	বুদ্ধি যার বল তার (জীবন কথা) ...	লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ ...	৮১৭
১৪।	মাতৃপূজা (সত্য ঘটনা) ...	বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী ...	৮১৯
১৫।	পাথরের সুতো (জানবার কথা) ...	— ...	৮২২
১৬।	উদ্‌ভ্রান্ত টারজান (অ্যাডভেঞ্চার) ...	সব্যসাচী ...	৮২৩
১৭।	আবহাওয়ার ফল (জানবার কথা) ...	— ...	৮৩১
১৮।	দেবগিরির দানব (ধারাবাহিক রহস্য-উপন্যাস)	রাজকুমার মৈত্র ...	৮৩২
১৯।	"৺কুমারী রীতা রায় স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা) ...	— ...	৮৩৯
২০।	হাঁদা-ভোঁদার টেকনিক (ছবিতে গল্প) ...	— ...	৮৪০
২১।	সান্ত্বনা নাই (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	বিশন মিত্র ...	৮৪২
২২।	রক্তচোষার শিকার (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	অনুরাধা মুখার্জী ...	৮৪৭
২৩।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...	— ...	৮৫০

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত।

মূল্য ৭০ পয়সা

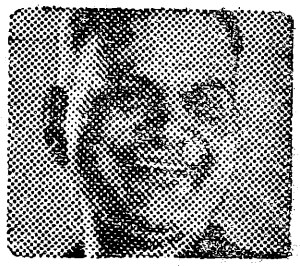

কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন... সারাদিন দাঁতের ক্ষয় রোধ করুন!

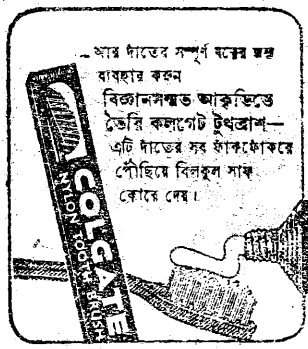

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণ করেছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে এবং খাবার ঠিক পরেই কলগেট পন্থায় দাঁত ব্রাশ করলে বেশিরভাগ লোকেরই দাঁতের আরও বেশি ক্ষয় বন্ধ হয় — যা দাঁতের মাজনের আবহমান কালের ইতিহাসে ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। কারণ কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে একবার মাত্র ব্রাশ করলেই শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দুর্গন্ধ ও ক্ষয় সৃষ্টিকারী জীবাণুদের দূর করা যায়। একমাত্র কলগেট তার প্রমাণ দিতে পারে। সেইসঙ্গে এতে কি অপূর্ব পিপারমিন্টের গন্ধ — তাইতো ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেন্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত ব্রাশ করতে ভীষণ ভালোবাসে।

মধুর স্নিগ্ধ শ্বাসপ্রশ্বাস ও শুভ্র উজ্জ্বল দাঁতের জন্য...
দুনিয়ায় বেশিরভাগ লোক অন্য যেকোন টুথপেস্টের চেয়ে বেশি কেনেন কলগেট।

DC G.41 BN

চতুর্বিংশ বর্ষ ঃ ১১শ সংখ্যা ❀ ১৩৭৮, পৌষ

উলটো আদর

শ্রীঅশোক সী

হাসবে যে রে ফিকফিকিয়ে
ধরবো তারি কানটা,
গান গাহিলে এক ধমকে
থামিয়ে দেবো গানটা।
চলবে না গান কোনমতেই
চলবে নাকো হাসি,
আমার কাছে ওসব ব্যাপার
বিচ্ছিরি আর বাসি।
বেদম হাসি পেলেও যদি
গোমড়া মুখে থাকে,
গান শুনলেই ভীষণ রেগে
পুলিস কে যে ডাকে—

সেই জেনো ভাই আমার কাছে
একেবারে খাঁটি,
আদর তারে করবো ঠিকই
মাথায় মেরে চাঁটি।

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

বাবলু বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু। এই নিয়ে ওরা পাঁচজন। একদিন দুপুরবেলা ওরা পাঁচজনে মিত্তিরদের বাগানে গিয়ে জুটল। ওদের সঙ্গে চলল কালো রঙের একটা দেশী কুকুর। কুকুরটার এক চোখ কানা বলে সবাই ওর নাম রেখেছে কানা পঞ্চু।

মিত্তিরদের বাগানে গিয়ে একটা বটগাছের নীচে ওরা বসল। বাবলু ওর প্যাণ্টের পকেট থেকে বার করল একটা কাঁচা আম। বিলু নুন আর লঙ্কা এনেছিল সঙ্গে। ভোম্বলের কাছে ছিল ছোট একটা ছুরি। তাই দিয়ে আমটাকে কুচি কুচি করে কেটে নুন লঙ্কা মাখিয়ে বেশ জুতসই একটা খাবার চিজ করে ফেলল ওরা। বাচ্চু আর বিচ্ছু নেহাতই ছোট বলে ওরা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। তারপর যখন ভাগ হোল তখন সবার ভাগেই সম পরিমাণ পড়ল। বাবলু বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল আমের কুচি।

আমের কুচি খাওয়া হলে ওরা বাগানের আনাচে কানাচে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বাগানের এক কোণে ছিল মস্ত এক ভাঙা বাড়ি। বহুদিনের পুরনো। মানুষ বাস করে না। দোতলা বাড়ি। একদিকের ছাদ নেই। একদিকের দেয়াল ধ্বসে পড়েছে। একদিকের ছাদে ছোট ছোট বটগাছ অশথগাছ ইত্যাদি গজিয়েছে। বাড়ির ভেতরে বাইরে ঘন ঘাস আগাছা ইত্যাদির বন হয়ে আছে। আগে এটা জমিদার বাড়ি ছিল। এখন ভূতের বাড়ি হয়েছে। ওরা পাঁচজনে ঘুরতে ঘুরতে সেই ভাঙা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

বাবলু বলল—চল। এই বাড়িটার ভেতরে ঢুকবি সবাই।

বিলু বলল—শুনেছি এটা নাকি ভূতের বাড়ি। যদি ভূত থাকে?

ভোম্বল বলল—বয়েই গেল। পাঁচ পাঁচজন আছি আমরা। ভূত আমাদের করবে কী?

বিলু বলল—না সেজন্যে নয়। মানে আমাদের সঙ্গে বাচ্চু বিচ্ছুও রয়েছে তো? তাই।

বাচ্চু বিচ্ছু একসঙ্গে বলে উঠল—ভূত আমার পুত, পেত্নি আমার ঝি, রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে করবে আমার কি?

বাচ্চু বিচ্ছুর ভয় নেই দেখে ওরা আর কেউ ভেতরে যেতে আপত্তি করল না। ভেতরে এসে একটা বড় হলঘরে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। ঘরের ভেতর একগাদা চামচিকে ছিল। ওরা যেতে কিচকিচ করে উড়ে পড়ল সব। বাবলু হঠাৎ বলল—দেখ, আমার মাথায় খুব ভালো একটা আইডিয়া এসেছে।

সবাই অমনি বলে উঠল—কি রকম কি রকম?

—এবার থেকে আমরা এইখানে এসেই খেলা করব। এই ঘরটাকে ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে এইখানে আমাদের অফিস হবে। আমাদের এই জায়গার খোঁজ কাউকে দেবো না আমরা। আমাদের এই পাঁচজনের একটা দল হবে। এই দলের একটা গোপন নাম দেওয়া হবে, সে নামটা আমরা ছাড়া আর কেউ জানবে না। আমাদের এই দলের কাজ হবে যে কোন উপায়ে লোকের ভালো করা। আর আমাদের দলের যা কিছু কথাবার্তা বা দেখা-সাক্ষাৎ সব এই ঘরেই হবে।

বিলু বলল—আইডিয়াটা মন্দ নয়। কিন্তু আমাদের দলের নাম কি হবে?

ভোম্বল বলল—কেন? পঞ্চপাণ্ডব এণ্ড কোং।

বাবলু বলল—দূর বোকা। এণ্ড কোং আবার হয় নাকি? তার চেয়ে শুধু পঞ্চপাণ্ডব। বা পাণ্ডব দি গ্রেট।

বাচ্চু আর বিচ্ছু বলল—না না। পাণ্ডব দি গ্রেট নয়। পঞ্চপাণ্ডবই ভালো।

বিলু বলল—কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবরা তো প্রত্যেকেই ব্যাটাছেলে ছিল।

ভোম্বল বলল—তাতে কি হয়েছে। বাচ্চু বিচ্ছু মেয়ে হলেও আমাদের কোন অসুবিধে হবে না। আমরা তো আর সত্যিকারের পঞ্চপাণ্ডব নই।

বাবলু বলল—তাহলে আজ থেকেই আমাদের দলের কাজ শুরু হয়ে যাক? প্রথমে সবাই মিলে ঘরটাকে পরিষ্কার করে ফেলি। তারপর চারিদিকে ইট পেতে আমাদের বসবার জায়গা করে ফেলব।

ভোম্বল বলল—তা ঘর পরিষ্কার করতে গেলে একটা ঝাঁটা তো চাই? তারপর জল ছিটোবার জন্য চাই একটা বালতি।

বিলু বলল—ঝাঁটা না হলেও চলবে। কালকাসুন্দে গাছের ঝাড় দিয়ে ঝাঁটা বানিয়ে নেবো। কিন্তু বালতি কোথায় পাবো ?

বিচ্ছু বলল—আমাদের পলিথিনের বালতিটা নিয়ে আসব বাবলুদা ?

বাচ্চু বলল—কি করে নিয়ে আসবি ? মা যদি দেখতে পায়।

সে আমি ঠিক নিয়ে আসব লুকিয়ে। —এই বলে বিচ্ছু চলে গেল বালতি আনতে।

ততক্ষণে বাবলু অন্যদের নিয়ে ঘর পরিষ্কারের কাজে লেগে গেল। ভোম্বল গোটা-কতক সিগারেটের খোল কুড়িয়ে তার উল্টোপিঠে প্রত্যেকের নামে সভ্য কার্ড তৈরি করতে লেগে গেল।

একটু পরে বিচ্ছু বালতি নিয়ে ফিরে এলে সেই বালতি করে জল এনে ঘরময় ছিটানো হোল। তারপর প্রত্যেককে সভ্য কার্ড বিলি করে বাবলু বলল—আজ এই পর্যন্তই। পরশু রবিবার এই ঘরে আমাদের প্রথম মিটিং বসবে। সেদিন সবাই যে যার সভ্য কার্ড নিয়ে আসবে কিন্তু। আর এখানে এসে চট করে কেউ ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়বে না। বাইরে থেকে হাতে তালি দেবে। তারপর আমি যখন জিজ্ঞেস করব, কে ? তখন বলবে 'পঞ্চপাণ্ডব'। তবেই এখানে ঢুকতে দেবো। নাহলে নয়। দলের গোপনীয়তার জন্য এসব নিয়ম দরকার। বুঝলে তো ? নাহলে যে কেউ এসে ঢুকে পড়বে। আর এসব কথা কারো কাছে বলবে না।

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। কাজেই পঞ্চপাণ্ডবেরা আর সেখানে রইল না। ওদের সেই এক চোখ কানা কালো কুকুরটা পঞ্চুকে নিয়ে যেমন এসেছিল তেমনি চলে গেল।

রাত্রিবেলা বিছানায় শুয়ে বিচ্ছুর হঠাৎ মনে হোল পলিথিনের বালতিটা তো সেই ভাঙা বাড়ির ভেতরেই ফেলে রেখে এসেছে। সেটা তো নিয়ে আসা হয়নি। বিচ্ছু তার পাশে শুয়ে থাকা বাচ্চুকে টিপনি দিয়ে ডাকল—এই দিদি ! শোন ?

বাচ্চুর তখন ঘুম এসেছিল। সে ঘুম ঘুম চোখে বলল—কি বলছিস বল ?

—বালতিটা সেখানেই পড়ে রয়েছে। নিয়ে আসা হয় নি।

—কি হবে তাহলে ?

—সকাল বেলা বালতি না পেলে মা কিন্তু খুব বকবে।

—ঠিক হয়েছে। তুই যেমন নিয়ে গেলি।

বিচ্ছুর খুব ভয় হোল। সে ভয়ে ভয়ে বলল—তুই আমার সঙ্গে যাবিরে দিদি ?

—কোথায় ?

—সেইখানে।

—তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এই রাত্তিরে কেউ আবার সেখানে যায়।

—বালতি না পেলে মা কিন্তু খুব বকবে।

বাচ্চু বলল—বকে বকবে। চুপ করে শুয়ে থাক। আমার ঘুম পাচ্ছে। আমাকে ঘুমোতে দে। এই বলে বাচ্চু পাশ ফিরে শুলো। বিচ্ছু আর কি করে, সেও চুপ করে শুয়ে রইল একপাশে। বিচ্ছু শুয়ে রইল বটে কিন্তু তার ঘুম এলো না। সে শুধু শুয়ে শুয়ে সেই বালতি-টার কথা ভাবতে লাগল।

সিঁড়ির উপর থেকে টর্চের আলো মুখের উপর এসে পড়ল। [পৃষ্ঠা ৭৮৪

তারপর এক সময় যখন দেখল বাচ্চু গভীর ঘুমে মগ্ন হয়ে গেছে, বিচ্ছু তখন চুপি চুপি উঠে বসল। তারপর আস্তে আস্তে দরজার কাছে গিয়ে খিলটা খুলে নেমে এলো রাস্তায়। রাস্তায় নেমে সোজা সে এগিয়ে চলল বাবলুদের বাড়ির দিকে।

বাবলুদের বাড়ির রকে তখন কানা পঞ্চু অর্থাৎ ওদের সেই কালো কুকুরটা শুয়ে ছিল। বিচ্ছুকে দেখেই কুঁই কুঁই করে এগিয়ে এলো সে। বিচ্ছু বলল—চল পঞ্চু। তোতে আমাতেই যাই। সেই ভাঙা বাড়িতে গিয়ে বালতিটা নিয়ে আসি।

পঞ্চু কি বুঝল কে জানে। এই রাতদুপুরে একটা অভিযানের গন্ধ পেয়েই বুঝি লেজ নেড়ে নেড়ে খুশীতে লাফাতে লাগল।

বিচ্ছু পঞ্চুকে নিয়ে এগিয়ে চলল সেই ভাঙা বাড়ির দিকে।

রাতের অন্ধকারে বাগানের এক কোণে ভাঙা বাড়িটা যেন প্রেতপুরীর মতো থম থম করছিল। বিচ্ছু আর পঞ্চু নিঃশব্দে বাগান পার হয়ে সেই ভাঙা বাড়িতে গিয়ে জুটল। ঘরের ভেতরটা তখন ঘন অন্ধকারে ঢাকা ছিল বলে বালতিটা যে ঠিক কোনখানে আছে

তা দেখতে পেলো না বিচ্ছু। অনেকক্ষণ ধরে এদিক সেদিক করে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। এমন সময় সিঁড়ির উপর থেকে হঠাৎ একটা টর্চের আলো ওর মুখের উপর এসে পড়ল। আর কে যেন একজন গম্ভীর গলায় বলে উঠল—কে রে তুই ?

সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চু ক্রুদ্ধ গলায় চিৎকার করে উঠল—ভৌ। ভৌ ভৌ ভৌ—উ—উ—উ। তারপরই আলো লক্ষ্য করে তীরের মতো ছুটে গেল সে।

বিচ্ছু তখন ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সে বুঝতে পারল না রাতদুপুরে এই লোকটা মানুষ না ভূত। পঞ্চু ছুটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভয় পেয়ে সেও চিৎকার করে উঠল।

বিচ্ছুর চিৎকার শুনে ওর কোন বিপদ হয়েছে মনে করে লোকটাকে ছেড়ে পঞ্চু আবার ছুটে এলো ওর কাছে। আর ঠিক তখনই মনে হল কে বা কারা যেন ছাদের উপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে পিছনের বাগানের দিকে লাফিয়ে পড়ল।

বিচ্ছু তখন কোন রকমে বালতিটা খুঁজে নিয়ে পঞ্চুর সঙ্গে বাড়ির দিকে দৌড়—দৌড়—দৌড়।

পরদিন সকালবেলা বাচ্চুকে সব কথা খুলে বলল বিচ্ছু। সব শুনে বাচ্চু চোখ দুটো বড় বড় করে বলল—বলিস কিরে! ভয় করল না তোর ?

—না। ভয় আবার কি ?

—আমি হলে তো হার্টফেল করতাম।

—তবে আলোটা যখন আমার মুখের ওপর পড়েছিল তখন কিন্তু ভয় করেছিল খুব।

—ওটা নিশ্চয়ই ভূতের আলো।

—চোর ডাকাতেরও তো হতে পারে ?

—এখন কি করা উচিত বল দেখি ?

—আমাদের দলের সকলকে কথাটা জানানো উচিত।

বিচ্ছুর কথাটা বাচ্চুর বেশ মনে ধরল। তাই সঙ্গে সঙ্গে সে তিন টুকরো কাগজে লিখে ফেলল 'বিশেষ জরুরি খবর। দুপুরেই অফিসে আসবে। —পঞ্চপাণ্ডব।' তারপর লেখা কাগজগুলো বাবলু বিলু আর ভোম্বলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌঁছে দিয়ে এলো।

তারপর দুপুরবেলা বাচ্চু আর বিচ্ছু যখন সেই ভাঙা বাড়িতে তাদের অফিস ঘরে গিয়ে পৌঁছুল তখন দেখল ওদের অফিস ঘরের দরজায় একটা লম্বা টিন দিয়ে ঘরে ঢোকার পথ কে যেন রোধ করে রেখেছে। ওরা যেতেই ভিতর থেকে কে বলে উঠল—বাইরে কে ?

বাচ্চু বলল—আরে! এ তো বাবলুদার গলা!

বিচ্ছু বলল—আমরা পঞ্চপাণ্ডব।

সঙ্গে সঙ্গে টিনটা সরিয়ে দিল বাবলু। বলল—সভ্য কার্ড এনেছ?

—হ্যাঁ।

—ভেতরে এসো।

ওরা দুজনে ভেতরে গিয়ে ঢুকল।

তারপর একে একে বিলু ও ভোম্বলও এসে জুটল।

সবাই জড় হলে যখন ওদের কথাবার্তা সবে শুরু হবে তেমন সময় বাইরে থেকে টিনটাকে কে যেন ঠ্যালাঠেলি করতে লাগল।

বাবলু 'হিস্‌স্‌' করে সকলকে চুপ করতে বলে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল—বাইরে কে?

বাইরে থেকে সাড়া এলো—ভৌ ভৌ।

সবাই তখন হেসে উঠল হো হো করে।

বাবলু টিনটা একটু ফাঁক করে দিলে পঞ্চু ঢুকল ভিতরে। তারপর বিচ্ছুর গা ঘেঁষে বসে মিটমিট করে দেখতে লাগল সকলকে।

বিচ্ছু ধীরে ধীরে গতরাত্রে তার এবং পঞ্চুর অভিযানের কথা বলতে লাগল সকলকে।

সব শুনে সবাই তো অবাক্ হয়ে গেল।

বাবলু বলল—আমি বিচ্ছুর সাহসের প্রশংসা করি।

বিলু বলল—কিন্তু এই রকমই যদি হয়ে থাকে তাহলে এর পরেও কি আমাদের এখানে অফিস রাখাটা ঠিক হবে?

ভোম্বল বলল—তাছাড়া অফিস করবেই বা কোথায়? এমন নিরিবিলি জায়গা কোথায় পাবে? অথচ যা হয়ে গেল তার পরে—।

বাবলু বলল—দেখ, ভিতু ছেলের মতো কথা বলিস না। ভিতু ছেলেদের জন্যে আমাদের এই দল নয়। অফিস এইখানেই হবে। আর আমাদের কাজ শুরু হবে আজ থেকেই। আজ রাত্রি বারোটার সময় সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন আমাদের বাড়ির লাইট পোস্টের নীচে এসে দাঁড়াবি তোরা। সেইখান থেকেই দল বেঁধে আমরা এখানে আসব। তবে পঞ্চুকে এবারে আমাদের সঙ্গে নেবো না। কেননা যদি ভৌতিক ব্যাপার হয়, তাহলে কুকুরে তো ভূত চেনে, ও ব্যাটা চেঁচিয়েই সব মাটি করে দেবে।

ভোম্বল বলল—কিন্তু পঞ্চু আমাদের সঙ্গে থাকলে ··।

বাবলু বলল—অর্ডার। অর্ডার।

পঞ্চুও অমনি প্রতিবাদ করে উঠল—ভৌ ভৌ।

বাবলু বলল—না পঞ্চু। আমাদের আজকের এই অভিযানে তোমাকে আমরা সঙ্গে নিতে পারব না।

বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু সবাই বাবলুর প্রস্তাব সমর্থন করল।

রাত ঠিক বারোটা বাজার পরই ওরা সকলে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে উপস্থিত হোল। তারপর সবাই মিলে গিয়ে হাজির হোল সেই ভাঙা বাড়ির মধ্যে।

চারদিক ঘন অন্ধকারে ঢাকা। টর্চের আলো ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। বাবলুর কাছে একটা টর্চ ছিল তাই রক্ষে। বাবলু বলল—আজ রাত্রেই আমরা এই বাড়ির সমস্ত ঘর ঘুরে ঘুরে দেখব।

বিলু বলল—আমরা এতজন যখন আছি তখন ভূত নিশ্চয়ই বেরোবে না কি বল?

ভোম্বল বলল—সঙ্গে একটা আঁশবঁটি নিয়ে এলে ভালো হত।

বাবলু বলল—ভূতকে এত ভয় কেন রে তোদের? লড়তে হয় তো ভূতের সঙ্গে খালি হাতেই লড়ব।

বিচ্ছু বলল—আমি সঙ্গে একটা গুলতি নিয়ে এসেছি বাবলুদা।

বাবলু উৎসাহিত হয়ে বলল—এনেছিস! খুব ভালো কাজ করেছিস। অনেক কাজে লাগবে ওটা। দে। গুলতিটা আমার হাতে দে।

বিচ্ছু গুলতিটা বাবলুর হাতে দিল।

বাবলু হঠাৎ 'হিস্‌স্' করে সবাইকে চুপ করতে বলল। সবাই তখন কান খাড়া করে শুনল ছাদের উপর কেমন যেন একটা খস খস আওয়াজ হচ্ছে।

এই ঘন অন্ধকারে বাড়িটা যেন সত্যই প্রেতপুরীর মতো মনে হোল তখন। মাঝে মাঝে জোনাকির মিটিমিটি আলোয় আরো বিভীষিকাময় মনে হোল। বাইরের চাঁপা গাছের ডালে একটা প্যাঁচা ডাকল—শ্যাঁ-স্। শ্যাঁ—স্—স্। শ্যাঁস্।

ওরা টর্চের আলো নিভিয়ে দিল।

তারপর নীরবে ঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ওরা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বাবলু বলল—আমার পিছু পিছু সবাই আয়। তারপর বিলুর হাতে গুলতিটা দিয়ে বলল—বিলু তোর অব্যর্থ টিপ। যদি দেখিস আমাদের মুখের ওপর

কোন আলো এসে পড়ছে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আলো লক্ষ্য করে গুলতিটা টিপ করবি। গোটাকতক ঢিল পকেটে কুড়িয়ে রাখ।

বিলু তাই করল। তারপর সবাই মিলে এগিয়ে চলল বাবলুর পিছু পিছু।

ওরা এ ঘর সে ঘর করে দোতলায় উঠে এলো। দোতলার বারান্দা পার হয়ে একটা ঘরের কাছে যেতেই দেখল ঘরের ভেতর থেকে মৃদু একটু আলোর রেখা বাইরে ভেসে আসছে।

ওরা খুব সন্তর্পণে ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখল একটা লোক মুখে কাপড় বাঁধা অবস্থায় ঘরের মেজেয় পড়ে আছে। আর দুটো কঙ্কাল তার বুকের ওপর ছুরি উঁচিয়ে ভয় দেখাচ্ছে তাকে।

ওদের মুখের উপর নিক্ষেপ করে বলল—কে। কে ওখানে? [পৃষ্ঠা ৭৮৮

কি ভয়ংকর সেই দৃশ্য! একটা কঙ্কাল মানুষের গলায় বলল—শীগগির এই কাগজটাতে তুমি লিখে দাও যে আমরা যাওয়া মাত্রই তোমার বাড়ির লোকেরা আমাদের হাতে সমস্ত টাকাকড়ি সোনাদানা দিয়ে দেবে। না হলে আজ রাতেই তোমাকে খুন করে এই বাগানে চাঁপা গাছের গোড়ায় পুঁতে ফেলব। তোমার মতো আরো অনেককে এইভাবে সরিয়ে দিয়েছি আমরা। অতএব যা বলি তা চটপট করে ফেলো।

এইসব দেখে শুনে তো পঞ্চপাণ্ডবদের চক্ষুস্থির হয়ে গেল। কঙ্কাল যে মানুষের মতো কথা কয় তা ওরা জানত না। তাছাড়া ওরা ভেবেও পেল না কঙ্কাল মানুষকে ভয় দেখিয়ে টাকা চাইতে যাবে কেন!

বিলু বলল—বাবলু, কেটে পড় মাইরি। হাওয়া খারাপ।

ভোম্বল বলল—একেবারে সত্য সত্যই ভূতের পাল্লায় পড়লাম তাহলে?

বাবলু আর থাকতে পারল না। রেগে গিয়ে ঠাস করে ভোম্বলের গালে একটা চড় মেরে বলল—চুপ কর ইডিয়েট।

কঙ্কাল দুটো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে তাকাল। তারপর চট করে বাতিটা নিভিয়েই টর্চের এক ঝাঁক তীব্র আলো ওদের মুখের উপর নিক্ষেপ করে বলল—কে! কে ওখানে?

ওরা অমনি সকলে সমস্বরে বলে উঠল—আমরা পঞ্চপাণ্ডব। তোমরা কে?

বিলু রেডি হয়েই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে সে একটু আড়াল হয়ে টর্চের মুখ লক্ষ্য করে গুলতির ঢিলটা টিপ করে ছেড়ে দিল। টর্চের আলো ঝনঝন করে নিভে গেল তক্ষুণি। ওদের আলো নিভে যাওয়া মাত্রই জ্বলে উঠল বাবলুর হাতের টর্চ।

হঠাৎ একটা কঙ্কাল চিৎকার করে উঠল—ভূত—ভূত। এ নিশ্চয়ই ভুতুড়ে ব্যাপার। বলেই গোঁ গোঁ করে অজ্ঞান হয়ে গেল সে।

অপর কঙ্কালটা ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠে বলল 'মাই গড'। বলেই এক লাফে পাশের ভাঙা জানালাটা দিয়ে হাওয়া। তারপর দুড়দুড় করে সিঁড়ি দিয়ে দে দৌড়।

বাবলু, বিলু, ভোম্বল, বাচ্চু, বিচ্ছুও আচমকা ঐ রকমটা হয়ে যাওয়ায় স্তব্ধ হয়ে গেল। এমন সময় ছাদের ওপর থেকে পঞ্চুর গলা শোনা গেল—ভৌ ভৌ। ভৌ—উ—উ।

বাবলু অবাক্ হয়ে বলল—পঞ্চু কোত্থেকে এলো? পঞ্চুকে তো আনিনি আমরা।

বিচ্ছু বলল—ও নিশ্চই লুকিয়ে আমাদের পিছু পিছু পালিয়ে এসেছে। যাক ভালোই হোল।

বাবলু ডাকল—আয় আয়। পঞ্চু আয়। আমরা এখানে আছি।

কিন্তু পঞ্চু তখন কোথায়? ওরা বারান্দার কাছে এগিয়ে এসে দেখল পঞ্চু তখন পলায়মান সেই কঙ্কালটাকে ধরবার জন্য তীরের মতো ছুটেছে।

বাবলু বলল—যাক। পঞ্চু যখন গেছে তখন আমাদের আর ওদিকে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। এখন ঘরের ভেতরে ঢুকে কি ব্যাপার তা দেখা যাক।

ওরা সকলে ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর টর্চ জ্বেলে সেই অচৈতন্য কঙ্কালটার কাছে এগিয়ে গেল ওরা। বিলু আর ভোম্বল হাত পা বাঁধা লোকটার বাঁধন খোলার কাজে লেগে গেল।

লোকটা মুক্তি পেতেই তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে জ্বেলে ফেলল বাতিটা। বাতির আলোয় ঘরটা আলোকিত হয়ে উঠতেই ওরা দেখল, এতক্ষণ দূর থেকে যাকে ওরা কঙ্কাল বলে মনে করেছিল আসলে সে কঙ্কালই নয়। কঙ্কালের পোশাক পরা একটা মানুষ মাত্র। তার কালো পোশাকের উপর সাদা ডোরা এমনভাবে আঁকা যে তাকে আচমকা দেখলে সত্যিকারের কঙ্কাল বলে মনে হয়। মানুষটা তখনও অজ্ঞান হয়ে ছিল। ওরা সেই অবস্থাতেই বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেলল তাকে।

এদিকে সেই ভদ্রলোক তো মুক্তির আনন্দে তখন গদগদ হয়ে বললেন—কে বাবা ? কাদের ছেলে তোমরা ? আমার প্রাণ এমনভাবে বাঁচালে ?

বাবলু বলল—আমাদের পরিচয় পরে নেবেন। এখন যান। তাড়াতাড়ি আপনি গিয়ে থানায় খবর দিন। আমরা ততক্ষণ এই লোকটাকে পাহারা দিচ্ছি।

ভদ্রলোক বললেন—ঠিক বলেছ বাবা। আমি এক্ষুণি থানা থেকে পুলিস ডেকে আনছি। তোমরা একটু অপেক্ষা করো। বলে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

দূর থেকে পঞ্চুর ভৌ ভৌ ডাক তখনও কানে আসছে। এই বাড়িটার পিছন দিকে একটা পুকুর আছে। খুব সম্ভবতঃ কঙ্কালের পোশাক পরা সেই লোকটা পালাতে না পেরে পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছে। আর পঞ্চু তাকে উঠতে দিচ্ছে না।

খানিক পরেই বাগানে একটা গাড়ি এসে থামার শব্দ পাওয়া গেল। বাবলু বলল—নিশ্চয়ই পুলিসের গাড়ি।

ভোম্বল বারান্দার কাছে এগিয়ে গিয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখল সত্যই পুলিসের গাড়ি সেটা। গাড়ি থেকে একদল পুলিস নেমে এলেই ভোম্বল ওপর থেকে হেঁকে বলল—আমরা সবাই এখানে আছি। আপনারা সোজা ওপরে উঠে আসুন।

পুলিসের লোকেরা দ্রুত উঠে এলো উপরে। ওদের সঙ্গে ছিলেন সেই ভদ্রলোক এবং থানার বড় দারোগা। ভদ্রলোক বললেন—এই যে। এই ছেলেরা।

দারোগাবাবু বাবলুর কাঁধে হাত দিয়ে বললেন—খুব সাহসী ছেলে তো হে তোমরা ? অ্যাঁ! এমন তো দেখা যায় না। কারা তোমরা ? এত রাত্রে এখানে কেন এসেছিলে ?

বাবলু তখন একে একে সব কথা খুলে বলল। সব শুনে দারোগাবাবু অত্যন্ত খুশী হয়ে বললেন—এই ভদ্রলোক একজন এম. এল. এ.। নাম নরেশচন্দ্র রায়। খুব বড়লোক। থাক। ভালোই হয়েছে। তোমাদের জন্য এনার প্রাণ বেঁচেছে। এই বলে তিনি সেই অচৈতন্য লোকটার দিকে ঝুঁকে পড়ে দেখেই বললেন—আরে! এ ব্যাটা যে একজন দাগী আসামী। আমি অনেকদিন ধরে খুঁজছি ব্যাটাকে।

বাবলু বলল—আরো একজন আছে। সে গিয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছে। আমাদের ট্রেনিং দেওয়া কুকুর পাহারা দিচ্ছে তাকে।

দারোগাবাবু সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে অ্যারেস্ট করে কয়েকজন কনস্টেবলকে নিয়ে ছুটলেন পুকুর পাড়ে। ওরাও সকলে চলল। গিয়ে দেখল এক মহা কেলেঙ্কারি ব্যাপার। পঞ্চু লোকটাকে এমন বেকায়দায় ফেলেছে যে সে ব্যাটা কিছুতেই আর ওপরে উঠে আসতে পারছে না। যেদিক দিয়ে সে উঠতে যায় পঞ্চু সেই দিকেই তাকে তাড়া করে। লোকটা তাই নিরুপায় হয়ে জলের ওপর রসগোল্লার মতো ভাসছে।

বাবলু গিয়ে পঞ্চুকে থামাতে পুলিসের লোকেরা তাকে জল থেকে তুলে অ্যারেস্ট করল। তারপর সবাই মিলে গিয়ে বসল গাড়িতে।

পঞ্চ পাণ্ডবদের এই নৈশ অভিযানের ফলে দু-দু'জন দাগী আসামী ধরা পড়ল এবং একজন এম. এল. এ.র প্রাণ বাঁচল। পুলিসের গাড়ি সেই রাত্রে তাই পঞ্চ পাণ্ডবদের প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে প্রত্যেককে পৌঁছে দিয়ে এলো। দারোগাবাবু পঞ্চপাণ্ডবের প্রত্যেকের মা বাবাকে ধন্যবাদ জানালেন।

আর সেই ভদ্রলোক অর্থাৎ নরেশচন্দ্র রায় তার পরদিন পঞ্চপাণ্ডবদের মা বাবা সমেত প্রত্যেককে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ালেন। তবে সে নিমন্ত্রণে কানা পঞ্চুও বাদ পড়ল না।

কি রকম দেখতে

চিরদিন মানুষ দেখে আসছে পৃথিবী গোলাকার কিন্তু ওপরে ও নীচে একটু চাপা। সম্প্রতি যে সব কৃত্রিম উপগ্রহ মহাশূন্যে পাঠান হয়েছে সেই উপগ্রহের মধ্যে নানা রকম যন্ত্র বসান আছে। তার সাহায্যে যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে চিরদিনের ধারণা পৃথিবী গোলাকার ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীকে অনেকটা ন্যাসপাতি জাতীয় পিয়ারের মত দেখতে। ছবিতে চিক্ দিয়ে দেখান হয়েছে।

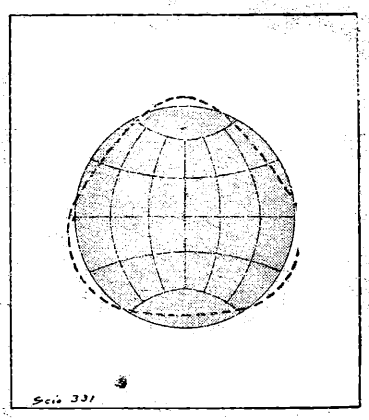

চিকাগোর বিমান বন্দর

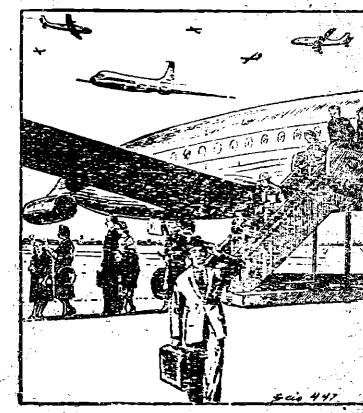

১৯৫৯ সালের ঘটনা। হিসাব করে দেখা গেছে যে চিকাগোর বিমানবন্দরে প্রায় প্রতিদিন ৩৪৫১৭০ বার বিমান ওঠা—নামা করে। এত বিমান যাতায়াত পৃথিবীর আর কোন বিমান বন্দরে হয় কিনা সন্দেহ।

কাপুর সিং ও দল-খালসা

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

"গুরুদাসপুর গড়ে
বন্দা যেদিন বন্দী হইল তুরানী সেনার করে—"

শিখ জাতির সেদিন বড় দুর্দিন।

বন্দার চোখের উপর সেদিন নিহত হল তাঁর বালকপুত্র, বন্দা নিজে হস্তীপদতলে নিষ্পিষ্ট হয়ে প্রাণ হারালেন। প্রত্যেকটি শিখ সৈনিকের মাথার উপর মূল্য ঘোষণা করল মুঘল সরকার। যদিও সে মূল্যের লোভে পঞ্চনদবাসী কোন শিখ বা অশিখ প্রলুব্ধ হল না বেইমানী করতে।

যুদ্ধের সময় যারা ধরা পড়েছিল, তারা আর ঘরে ফিরল না কেউ। কিন্তু তখন যারা ধরা পড়েনি, সংখ্যায় মুষ্টিমেয় নির্বাণোন্মুখ বহ্নিকুণ্ডে তারাই ইন্ধন যুগিয়ে চলল ক্রমাগত। বহুদিন গত হয়েছেন বাবা নানক, গুরুর পরে গুরু প্রাণ দিয়েছেন মুঘলের নির্মম অত্যাচারে, কিন্তু তাঁদের শিক্ষা, তাঁদের আদর্শ এখনও প্রবুদ্ধ, উদ্দীপ্ত করে রেখেছে শিখজাতিকে। সে-উদ্দীপনাকে ঝিমিয়ে যেতে দেওয়া হবে না, হতাবশেষ শিখ সৈনিকদের এই অটল প্রতিজ্ঞা।

শিখ কৃষক লাঙ্গল ঠেলে আর আকাশপানে চায়, কান পেতে শোনে প্রভাত সমীরণে স্বাধীনতার নতুন বার্তা কোন দিগন্ত থেকে ভেসে আসছে কিনা। শিখ সৈনিক কৃপাণে শান দেয় আর প্রভাত রৌদ্রের ঝলকানির ভিতর খোঁজে—শহিদের রক্তের ছোপ এখনও তার গায়ে গায়ে ওতপ্রোত হয়ে মিশে রয়েছে কিনা।

আসবে—সেদিন আসবে আবার—শিখ যেদিন স্বাধীন হবে, "নূতন উষার সূর্যের পানে

চাহিবে নির্নিমিখ।" প্রত্যেকে প্রত্যাশায় আছে একটা উদাত্ত আহ্বানের "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" বলে একটা মহানির্ঘোষ মন্দ্রিত হয়ে উঠবে পঞ্চনদের কোন এক অজ্ঞাত কোণ থেকে। তাই শুনে অস্ত্র হাতে ছুটে বেরুবে শিখেরা, "কার আগে প্রাণ কে করিবে দান, তারই লাগি কাড়াকাড়ি।"

অবশেষে এক শুভ প্রভাতে এল সে আহ্বান।

অখ্যাত শহর ফৈজুল্লাপুর, তারই অখ্যাততর অধিবাসী কাপুর সিং-এর কণ্ঠ থেকে—

"শিখ ভাইয়েরা ঐক্যবদ্ধ হও, ছিঁড়ে ফেল পরবশ্যতার শৃঙ্খল, গ্রামে নগরে প্রতিষ্ঠা কর স্বাধীনতার শক্তিকেন্দ্র—"

সে-আহ্বানে তড়িৎ-প্রবাহ বয়ে গেল প্রতি শিখের ধমনীতে ধমনীতে, প্রতিষ্ঠা হল "দল খালসা"র। মুক্ত মানবগোষ্ঠীর।

চিরশত্রু মুঘল দরবার এই মুহূর্তে নির্বিষ ভুজঙ্গে পরিণত হয়েছে। নাদির শাহের আক্রমণে মেরুদণ্ড বিচূর্ণ হয়েছে তার, বিষদন্ত হয়েছে উৎপাটিত। ও-দাঁত হয়ত আবারও গজাবে, কিন্তু তার আগে দল খালসা কি আত্মরক্ষার মত শক্তিটুকুও অর্জন করতে পারবে না? পারতেই হবে। দূর কর বিলাস ব্যসন, অহর্নিশির জপমন্ত্র হোক—"আরাম হারাম হ্যায়"—

পূর্ণোদ্যমে চলেছে শিখের শক্তিসাধনা। কাপুর সিং এর জীবন যেন একটা বিরামহীন ঘূর্ণিঝঞ্ঝা। সারা পঞ্চনদে ঝটিকার বেগে তাঁর সফর, বাধা-বিঘ্ন চূর্ণ করে, দ্বিধা-সংকোচ ঝেটিয়ে বিদায় করে প্রত্যেকটি শিখ নরনারীকে তিনি করে তুলছেন নির্ভীক নির্মম। যে-কোন মুহূর্তে মৃত্যুবরণে প্রস্তুত।

নাদির শাহের মুষলের আঘাত থেকে একটু একটু করে গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে মুঘল, এমন সময় এল ভগবানের নতুন চাবুক, আহমদ আবদাল। মাথা যেটুকু খাড়া করেছিল দিল্লী দরবার, তা আবার হল ভূলুণ্ঠিত। পাঞ্জাবের বুকের উপর দিয়েই আনাগোনা আবদালির, যাতায়াতের মুখে অনাচার অত্যাচারও তার সৈন্যেরা করে বই কি। কিন্তু তাতে তেমন বিচলিত হল না কাপুর সিং।

আবদালি একটা সাময়িক উপদ্রব মাত্র, ওর উপস্থিতিকালটুকু বেতসবৃত্তি অবলম্বনে কাটিয়ে দেওয়াই সমীচীন—এই হল কাপুর সিং-এর পরামর্শ। ও চলে যাক নিজের কাজ সেরে, শিখেরা আবার তখন এসে নিজের জায়গাটি পূর্ণ জৌলুশে জুড়ে বসবে। ঝড়ের সঙ্গে ঝগড়া করতে গেলে গাছেরই মাথা ভাঙে।

বারবার হানা দিয়েছেন আহমদ আবদালি, প্রতিবারের হানাতেই দিল্লী হয়েছে দুর্বল থেকে দুর্বলতর। আর শিখ হয়ে উঠেছে শক্তিমান থেকে আরও শক্তিমান। এল তারপর

তৃতীয় পানিপথ, মারাঠা শক্তিকে পর্যুদস্ত করে ঘরে ফিরছেন বিজেতা আবদালি, হঠাৎ একটা নতুন অভিজ্ঞতা হল তাঁর। নতুন এবং অপ্রত্যাশিত।

"শিখও শুধু শিখ নয়, মারাঠাও শুধু মারাঠা নয়,…

পঞ্চনদের পথ আর তাঁর পক্ষে অবারিত নয়। উপত্যকায় উপত্যকায় গড়ে উঠেছে প্রতিরোধ, শতদ্রুবিপাশার কূলে কূলে ঘাঁটি করে বসে আছে কেশ-কিরপান-কাচ্ছাধারী তেজীয়ান শিখ, মিছিলে মিছিলে সহস্র দৃপ্ত কণ্ঠে ধ্বনি উঠছে—"ওয়া গুরুজীকি ফতে—"

নির্বিবাদে আর হানাদারকে পথ ছেড়ে দেবে না পঞ্চনদবাসী। মারাঠার রক্তে ভেসে গিয়েছে পানিপথ। তার যতটুকু সম্ভব বদলা নেবে দল খালসা। কাপুর সিং নতুন মন্ত্র দিয়েছেন শিখের কানে—"শিখও শুধু শিখ নয়, মারাঠাও শুধু মারাঠা নয়, সবার উপরে তাদের সবাইয়ের এই পরিচয়ই ধ্রুব এবং শ্রেষ্ঠ যে তারা ভারতীয়। ভারতের এক অঙ্গে আঘাত হানলে অন্য অঙ্গ থেকে প্রত্যাঘাত আসবেই—"

পানিপথ বিজয়ের গৌরব আর আনন্দ ম্লান নিষ্প্রভ হয়ে গেল আবদালির শিখ মিছিল-সমূহের এই বেপরোয়া প্রতিরোধে। পাঁচ বৎসর পরে তিনি আবার যখন ভারতে হানা দিলেন, তখন অগ্রসর হলেন অতি সন্তর্পণে প্রত্যেকটা পদক্ষেপের আগে পঞ্চনদের নাড়ীর স্পন্দন সাবধানে পরীক্ষা করে করে।

না, আর ভারতের পথ তত সুগম নেই আগের মত। সজাগ প্রহরী বসেছে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে, রণোন্মাদ দল খালসা। হানাদারির উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এল আবদালির। শেষ জীবনে তাঁর এই হল তিক্ত উপলব্ধি যে পাশা উলটেছে, এবার হানা আসবে ভারতের দিক থেকে কাবুলে। সে আশঙ্কা তাঁর সত্যে পরিণত হল—শতাব্দীর একটা পাদ পূর্ণ হবার আগেই পঞ্জাবকেশরী রণজিত সিংহের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই।

মুঘল শক্তি দিন দিন নিবে আসছে। কোন দিক থেকে হাওয়ার একটা মাত্র ঝাপটা আসবার অপেক্ষা, তা এলেই মুঘল গরিমা অতীতের গর্ভে ডুবে যাবে চিরদিনের জন্য। ভারতে

দেখা দেবে শক্তির শূন্যতা। সে শূন্যস্থান পূরণ করা কি শিখের পক্ষে সম্ভব নয়? কাপুর সিং চিন্তা করেন, পরামর্শ করেন মিছিলনেতৃগণের সঙ্গে।

জনে জনে সুনিপুণ যোদ্ধা শিখেরা। অভাব শুধু তাদের একটি। সংঘবদ্ধ ঐক্য। সে জিনিস গড়ে তুলতে হলে চাই শক্তিকেন্দ্র একটা। সব দিক্ দিয়ে উপযুক্ত স্থান ছিল লাহোর। কিন্তু মুঘলের অস্তগমনের পরে সে মহানগরী এখন আবদালির কুক্ষিগত। ফাঁকা ময়দানে মুখোমুখি লড়াই করা এক জিনিস, আর দুর্ভেদ্য দুর্গ থেকে কামানবাজ দুশমনকে স্থানচ্যুত করা অন্য জিনিস। লাহোর অধিকার করা আপাততঃ অসম্ভব।

কাজেই গড়ে তুলতে হবে নতুন কেল্লা। পঞ্চনদের কেন্দ্রস্থলে, যাতে যে-কোন সীমান্ত থেকে শিখেরা সহজে এসে জমায়েত হতে পারে সেখানে।

খুঁজে খুঁজে একটি স্থান পছন্দ করলেন কাপুর সিং। রাভি নদীর কূলে ডালেওয়াল পাহাড়, তারই চূড়ায়। স্থলপথে জলপথে সমানই অধিগম্য। শত্রুর দুষ্প্রবেশ্য। চমৎকার আবহাওয়া, পানীয়জল অফুরন্ত। এইখানেই গড়তে হবে শিখরাষ্ট্রের প্রথম কেল্লা।

গুরু গোবিন্দ, তেগবাহাদুর, অর্জুন সিং, বন্দা—পথে পথেই যুদ্ধ করেছেন চিরদিন। সুরক্ষিত একটা দুর্গ তাঁদের কারও ছিল না। থাকলে অত সহজে মুঘল বার বার তাঁদের নির্জিত করতে পারত না। কাপুর সিং সে-ত্রুটি ঘোচাবেন মনস্থ করেছেন। পথচরের পক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

দুর্গ হবে ডালেওয়ালে। হঠাৎ একটা বিঘ্ন উপস্থিত হল।

মুলতানে তখন পর্যন্ত জনৈক মুঘল ফৌজদার অধিষ্ঠান করছেন। নামে তিনি দিল্লীর বাদশাহের কর্মচারী, কিন্তু সাক্ষীগোপাল বাদশাহ এখন এমন শক্তি রাখেন না, যাতে দূরস্থ কোন কর্মচারিকে আজ্ঞাবহ করে রাখা যায়। বিশেষতঃ মুলতানের দুর্গটি হল একান্ত দুর্ভেদ্য। সেখানকার ফৌজদারের উপরে যে প্রভু হুকুম চালাবেন, তাঁর থাকা দরকার অন্ততঃ দু'লক্ষ সেনা এবং দু'শো কামান।

সুতরাং মুলতানের ফৌজদার সাবুর খাঁ কার্যতঃ স্বাধীন এবং এই ডামাডোলের বাজারে স্বভাবতঃই উচ্চাশাপরায়ণ। মাঝে মাঝে তিনি স্বপ্ন দেখেন—সিন্ধু ও পাঞ্জাব এই দুটো প্রদেশকে একসাথে গেঁথে নিয়ে তিনি তার একচ্ছত্র সুলতান হয়ে বসবেন।

শিখ জাতিটাকে তিনি এ যাবৎ হিসাবের মধ্যে ধরেন নি। তাঁর শক্তিপরিধির প্রসারে ঐ হলবাহীরা যে কোনদিন কিছুমাত্র বাধা দিতে পারবে, এমন ধারণাই ঠাঁই পায় নি তাঁর মস্তিষ্কে। কিন্তু আজ?

"এ কী বাণী শুনি আজি?" দুই হাতে চোখ কচলে যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন

সাবুর খাঁ। শিখরা না কি কেল্লা গড়ছে? কেয়া তাজ্জব! পিঁপড়ের পাখা উঠছে। এ পাখা গজাবার আগেই মুচড়ে ভেঙে দেওয়া দরকার।

রাভির উপরেই লাহোর এবং অমৃতসর। রাভি দিয়ে সিন্ধুনদে পড়লে একটুখানি উজিয়েই মুলতান। দূরত্ব এমন কিছু নয়। পথও দুর্গম নয়। এরকম জায়গায় কখনো কাউকে কেল্লা গড়তে দিতে পারেন সাবুর খাঁ? বিশেষ করে ঐ শিখ হালুয়াগুলোকে? কারণ, নিঃস্ব এবং নিঃসহায় হলেও জাতটা গোঁয়ার। কেল্লার অভাব থাকলেও কয়েক যুগ ধরে ওরা টিকে আছে, দিল্লীশ্বরদের অক্লান্ত জিঘাংসা অগ্রাহ্য করে। এখন কেল্লা গড়তে পেলে ওরা কি আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে না?

সাধ করে উঠোনে কাঁটা গাছ বসাবেন না সাবুর খাঁ। তিনি সতর্ক হবেন সময় থাকতে।

শিখেরা সেদিন কেল্লার ভিত্তি-স্থাপন করবার জন্য সমবেত হয়েছে ডালেওয়াল পাহাড়ে। সংখ্যায় তারা বড় জোর হাজার খানিক হবে।

হঠাৎ কামান ডেকে উঠল কোথায়?

পোর্তুগীজদের একটা ছোট জাহাজ দেখা দিয়েছে রাভিনদীর বাঁকে। কামান ছুড়েছে ঐ জাহাজেরই আরোহীরা।

পোর্তুগীজ? পঞ্চনদে পোর্তুগীজ? এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এখানে ত তারা কোনদিন আসে নি! আসবার কারণই ঘটে নি! ওদের আসবার মত প্রলোভন ত এখানে কিছু নেই!

ওরা হানা দেয় সেইসব মুলুকে, অস্ত্রবলে যেখানকার অধিবাসীরা সবল নয়। হঠাৎ এসে পড়ে কামান বন্দুক নিয়ে, হতাহত করে গ্রামবাসী পুরুষ সবাইকে, বেঁধে নিয়ে যায় নারী ও শিশুদের, আমেরিকার বাজারে ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করার জন্য। এখানে ওরা আসবে কী করতে? ওরা ত ভালই জানে যে শিখদের উপরে হামলা করতে গেলে নিজেদেরও যথেষ্ট মার খেয়ে আসতে হবে, কামানের আওয়াজে মূর্ছা যাওয়ার মত দুর্বল কলিজা শিখদের নয়!

কামান? শিখেরা সাবধান হল। কাপুর সিংয়ের জেবে ছিল দূরবীন, চোখে লাগিয়ে এক পলক দেখে নিলেন রাভির বাঁকটা। তারপর ভৈরো সিং-এর হাতে দূরবীনটা দিয়ে রাভির জলের দিকে তাকালেন। কয়টা নৌকা আছে নদীতে? বারো খানা। এই সব নৌকায় চড়েই নদীকূলবাসী শিখেরা এসেছে আজ জমায়েতে।

বারোখানা নৌকায় শিখ চড়ল বারো বারং একশো চুয়াল্লিশজন। বাকী সবাই নেমে দাঁড়াল পাহাড়ের আড়ালে।

কাপুর সিং দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখে নিলেন রাভির বাঁধটা। [পৃষ্ঠা ৭৯৬

গোলার পরে গোলা বর্ষণ করছে পোর্তুগীজ জাহাজ।

অনুকূল হাওয়ায় পাল তুলে দিয়ে ছুটে আসছে রণপোত। দূরবীন হাতে পাটাতনের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন সাবুর খাঁ। তিনিই এই জাহাজ ভাড়া নিয়েছেন পোর্তুগীজদের কাছে। এই লড়াইটারই জন্য। দেদার টাকা ফিরিঙ্গিরা নিয়েছে সাবুর খাঁর। জাহাজে কামান বন্দুক সিপাহী—যা কিছু আছে, সাবুর খাঁরই তামাম, পোর্তুগীজদের একগাছা কুটোও নেই এতে।

জাহাজ দিয়েছে বটে ওরা, কিন্তু লোকসানের আশঙ্কা তাতে কিছু নেই। জাহাজ জখম বা ঘায়েল হয় যদি, সাবুর খাঁ ক্ষতিপূরণ করবেন পুরো পুরি।

জাহাজ ছুটিয়ে নিয়ে এলেন সাবুর খাঁ, কামান দাগতে দাগতে। দূরবীনের ভিতর দিয়ে তিনি দেখেছেন—প্রথম গোলাটা ছুটবার পরেই পাহাড় থেকে পিলপিল করে শিখেরা নেমে পালাচ্ছে হন্তদন্ত হয়ে। লম্বা কালো দাড়ির ভিতর দিয়ে দু'পাটি সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল সাবুর খাঁর, উচ্ছ্বসিত হাস্যে।

কিন্তু পালিয়েও নিস্তার পাবে না শিখেরা। সাবুর খাঁ এমন ব্যবস্থা করে যাবেন যাতে শিখেরা আর কোনদিন ডালেওয়ালে পদার্পণ করতে না পারে। তিনি ঐ পাহাড় দখল করে ওখানে ঘাঁটি বসিয়ে যাবেন, এবং সেই ঘাঁটিকেই পরিণত করবেন নিজেরই অন্যতম কেল্লায়।

জাহাজ ভিড়ল, পাহাড়ের আড়ালে বারোখানা নৌকা যে শিখ সৈনিকে বোঝাই হয়ে নীরবে প্রতীক্ষা করছে সুযোগের, তা কেমন করে জানবেন সাবুর খাঁ ?

পাহাড়ের মাথায় জনপ্রাণী নেই। দখল নেবার জন্য সাবুর খাঁ সসৈন্যে নেমে পড়লেন জাহাজ থেকে। তাঁরাও এদিকে পাহাড়ে উঠছেন, ওদিক দিয়ে নৌকা থেকে শিখেরাও জাহাজে উঠছে। সেদিকে হুঁশ নেই সাবুর খাঁর।

হুঁশ হল—যখন জাহাজ থেকে বিকট গর্জনে গোলা এসে পড়ল সাবুর খাঁরই ফৌজের উপরে। কী হল ? কী হল ?

ব্যাপারটা বুঝে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সাবুর খাঁ হুকুম দিলেন—"ফৌজ পাহাড়ের উলটো দিক দিয়ে নেমে যাও, বড্ডোই বেকায়দায় ফেলেছে দুশমনেরা—"

মুঘল ফৌজ নামতে গিয়েই খপ্পরে পড়ে গেল শিখ সৈনিকদের, যারা খোলা কৃপাণ উঁচিয়ে ওদেরই অপেক্ষায় ছিল এতক্ষণ। শিখ জমায়েতের মাত্র একশো চুয়াল্লিশটা জোয়ান তো জাহাজে চড়াও হয়েছে, বাকী সবাই ত এইখানে !

সাবুর খাঁর গোটা পল্টনটারই মৃতদেহ ডালেওয়াল পাহাড়ের মাথায় কবর দিয়ে তারই উপরে শিখেরা ভিত গাড়ল তাদের কেল্লার।

বেচারী পোর্তুগীজেরা ! জাহাজ খালাস করবার জন্য দশ হাজার টাকা কাপুর সিং-এর দরবারে জরিমানা দিতে হল তাদের।

এই ছবিটির মধ্যে কি কি জিনিস লুকিয়ে আছে বলতে পার ?

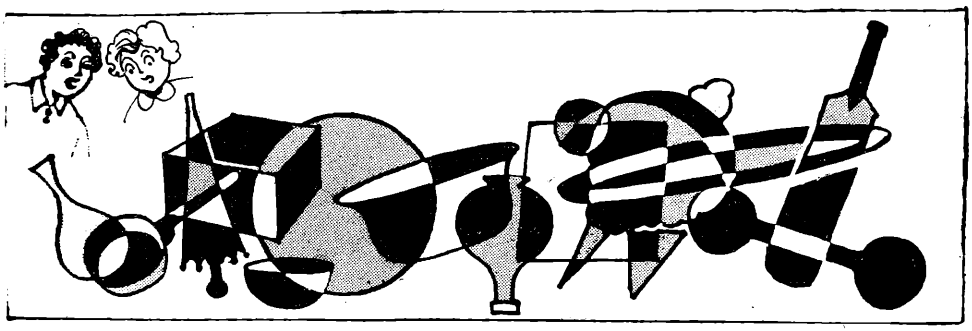

(না পারলে ৮১৬ পৃষ্ঠায় উত্তর দেখ)

অণিমা দে

হাড়কুঁড়ে নামে একটি ছেলে ছিল। সে ছিল একেবারে কুঁড়ের বাদশা। সে আর তার বিধবা মা এক অজ পাড়াগাঁয়ে বাস করতো। খাবার বিক্রি করে তাদের দিন চলতো বাড়িতে বসে থাকাট যেন হাড়কুঁড়ের একমাত্র কাজ ছিল। একদিন হাড়কুঁড়ের মা গেছে বাজারে, হাড়কুঁড়ে বাড়িতে একা জানলার কাছে বসে আছে চুপচাপ। হঠাৎ সে দেখতে পেল একজন লোক একটি কুকুর ও একটি বিড়ালকে শিকলে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। হাড়কুঁড়ে জানলা দিয়েই মুখ বাড়িয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো—"প্রাণী দুটোকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?"

ভিনদেশী লোকটি বললো—"এ দুটোকে নদীতে ডুবিয়ে মারবো বলে নিয়ে যাচ্ছি।"

লোকটির কথা শুনে হাড়কুঁড়ের মনে কষ্ট হলো, সে বললো—"তুমি এমন নিষ্ঠুরের মত কাজ করতে যাচ্ছ কেন?"

লোকটি উত্তর দিল,—"আর বল কেন, আমি হচ্ছি রাজবাড়ির রাঁধুনে ঠাকুর, এই দুটিতে মিলে কি করেছে জান? চুপিচুপি রান্নাঘরে ঢুকে রাজামশাইয়ের সকালের সব খাবার খেয়ে নিয়েছে।"

"ওহো, তাই বুঝি। আচ্ছা তুমি আমার একটা কথা রাখবে?" হাড়কুঁড়ে লোকটিকে বললো—"দয়া করে আমার কাছে ওদের বিক্রি করে দিয়ে যাও না? আমি কথা দিচ্ছি, এ দুটোকে আর কিছুতেই রাজবাড়িতে ঢুকতে দেবো না। দেখে নিও তুমি।"

"আমাকে তার বিনিময়ে কি দেবে শুনি?" লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

হাড়কুঁড়ে বললো—"এক ঝুড়ি চাল তোমাকে দিতে পারি।"

হাড়কুঁড়ে আর ওর বিধবা মা ভীষণ গরিব। ওদের ঘরে মূল্যবান জিনিস বলতে এক ঝুড়ি চাল ছাড়া আর কিছুই ছিল না। লোকটি তখন কুকুর ও বিড়ালকে রেখে তার বিনিময়ে

এক ঝুড়ি চাল নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

এদিকে হাড়কুঁড়ের বুড়ো মা বাড়ি ফিরে এসে দেখে এই কাণ্ড। তাদের একমাত্র সম্বল এক ঝুড়ি চালের বদলে কিনা একটি কুকুর আর একটি বিড়াল এনে রেখেছে বাড়িতে।

"ওরে হাড়কুঁড়ে"—বলে বুড়িমা চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো, আর বলতে লাগলো—"তুই কোন কাজ করিস না, মাঝখান থেকে এত কষ্টের যোগাড় করা চাল দিয়ে দিলি।"

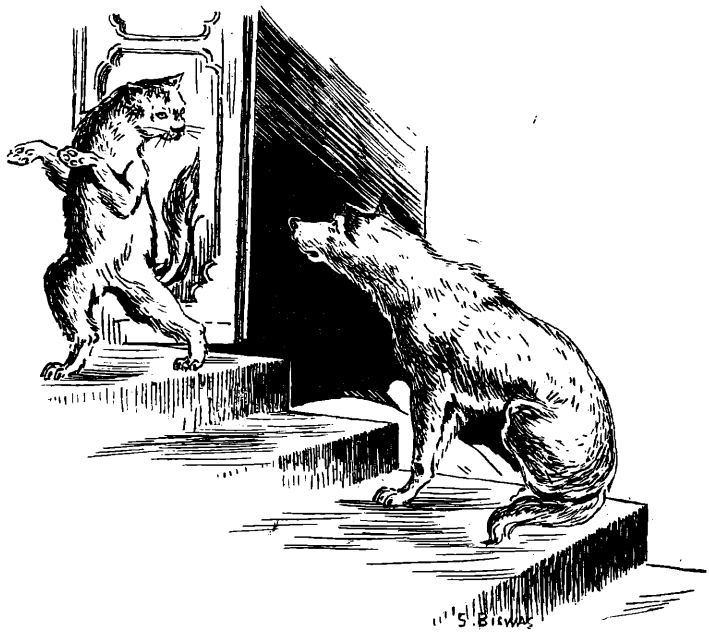

বিড়াল কুকুরকে সিঁড়ির মুখে পাহারায় বসিয়ে··· [পৃষ্ঠা ৮০০

মায়ের এরকম কান্না দেখে হাড়কুঁড়ের মনে খুব কষ্ট হলো। সে তক্ষুণি প্রতিজ্ঞা করলো,—আগামীকাল থেকে সে যে কোনো কাজে লাগবেই। এদিকে বিড়াল আর কুকুর ওদের কথা সবই শুনে নিয়েছে।

সেদিনই রাত্রিবেলা বিড়ালটি কুকুরটিকে ডেকে বলছে,—"দেখ বন্ধু, মৃত্যুর হাত থেকে হাড়কুঁড়ে আমাদের বাঁচিয়েছে। এসো আমরা ওকে যে কোনো কাজ করার হাত থেকে বাঁচাই।"

"বেশ তো আমি রাজী।" কুকুর বললো, "কিন্তু কি করা যায় বল তো।"

বিড়াল তখন কুকুরকে বুঝিয়ে বললো—"শোন সমুদ্রের ঠিক মাঝখানে সোনার প্রাসাদে এক রাজপুত্রের বাস। সেই রাজপুত্রের একটি লাল টুকটুকে ইচ্ছামতী চুণী আছে। আমরা যদি সেই চুণীটা এনে হাড়কুঁড়েকে দিতে পারি তবেই কাজ হয়।"

"ঠিক আছে, আমার পিঠে লাফ দিয়ে উঠে পড়।" কুকুরটি বললো,—"এইভাবে আমরা সাঁতরে যাবো, আর ইচ্ছামতী চুণীটি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবো।"

বিড়ালকে পিঠে নিয়ে কুকুরটি সাঁতার কেটে সমুদ্রের মাঝখানে সেই রাজপ্রাসাদে গিয়ে উঠলো। কুকুর আর বিড়াল চুপিসারে রাজপ্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো। বিড়াল

কুকুরকে সিঁড়ির মুখে পাহারায় বসিয়ে রাজপুত্রের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। রাজপুত্র তো মখমলের বিছানায় শুয়ে দিব্যি ঘুমুচ্ছে। ঘরে কে ঢুকেছে কিছুই জানতে পারেনি। আর এদিকে বিড়াল তো সমস্ত ঘরে এদিক, ওদিক, উপর, নীচ, খুঁজে খুঁজে হদ্দ হলো। কোথাও সেই চূণীর আংটি খুঁজে পেল না। তবে এক মজার ব্যাপার হলো। সেই ঘরে ছোট্ট এক ইঁদুরের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতেই, ভয়ে মুখ কাঁচুমাচু করে ইঁদুর বিড়ালকে বলতে লাগলো,—"বিড়াল ভাই, বিড়াল ভাই, দোহাই তোমার, আমাকে তুমি মেরো না। এখানে তুমি কিসের জন্য এসেছ, বল, আমি নিশ্চয় তোমাকে সাহায্য করবো।"

বিড়াল গম্ভীর স্বরে বললো—"আমি ইচ্ছামতী চূণীর আংটিটি চাই।"

"ঠিক আছে আমি তোমাকে ঠিক এনে দেবো।" ইঁদুর বললো, "আমি জানি রাজপুত্র চূণীটি সব সময় তার মুখের মধ্যে পুরে রাখে।"

এই কথা শুনে বিড়াল ইঁদুরকে রেহাই দিল। আর ইঁদুরটি তরতর করে ঘুমন্ত রাজপুত্রের বিছানায় উঠে পড়লো। খুব আস্তে আস্তে রাজপুত্রের নাকের কাছে গিয়ে লেজটি দিল রাজপুত্রের নাকের মধ্যে ঢুকিয়ে। রাজপুত্রের নাকে তখন দারুণ সুরসুরি লাগছে, ঘুমের মধ্যেই এমন জোরে হাঁচি দিল যে, ইচ্ছামতী চূণীটি রাজপুত্রের মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়লো মাটিতে। বিড়ালটি ছিল ওত পেতে বসে। যেই না চূণীটি ঠকাস করে পড়লো অমনি তুলে নিয়ে এক ছুটে চলে এলো কুকুরের কাছে। আর কুকুরও তক্ষুণি বিড়ালকে পিঠে নিয়ে সাঁতরে চললো তীরের দিকে।

তারপর তারা গেল হাড়কুঁড়ের কাছে চূণীটি নিয়ে। হাড়কুঁড়ে ঘুম থেকে সবেমাত্র জেগেছে। ওরা দু'জনে চূণীর আংটিটি হাড়কুঁড়েকে দিয়ে বললো "প্রভু সকালে উঠে কাজের জন্য আর আপনাকে ভাবতে হবে না। এই ইচ্ছামতী চূণীটিই আপনার সব কিছু করে দেবে।"

এই কথা শুনে হাড়কুঁড়ের তো মহাআনন্দ। সে তার মাকে ডেকে বললো, "মা তুমি আর দুঃখ করো না। আমি শীগগিরই রাজার মেয়েকে বিয়ে করতে যাচ্ছি।"

মা তো শুনে একেবারে অবাক্। তিনি বললেন, "কি বলছিস রে হাড়কুঁড়ে, এমন বোকার মত কথা বলিস না।"

হাড়কুঁড়ে বললো—"মা, তুমি আগে দয়া করে রাজপ্রাসাদে গিয়ে আমার জন্য রাজকন্যার পাণিপ্রার্থনা কর।"

মা তো এমন কথা বলার জন্য রাজবাড়িতে যেতে কিছুতেই সাহস পাচ্ছেন না। হাড়কুঁড়ে তখন ইচ্ছামতী চূণীর কথাটা মাকে বুঝিয়ে বললো। মা তখন খুশী মনে রাজবাড়িতে

গিয়ে সোজা রাজার কাছেই নিজের ছেলের জন্য রাজকন্যার পাণি প্রার্থনা জানালো।

রাজা একটু অবাক্ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার ছেলের কি কি গুণ আছে?"

"ইচ্ছে করলে সে যে কোন কাজ করতে পারে।"—গর্বিত মা উত্তর দিল।

"ঠিক আছে।" রাজা বললেন, "তোমার বাড়ি থেকে আমার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত একটি সোনার ও একটি রূপার সেতু তৈরি করতে বল তোমারছেলেকে। যদি সে এই কাজে কৃতকার্য হয় তবেই রাজকন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। যদি সে এই সেতু দুটো তৈরি করতে না পারে, তবে তাকে পুড়িয়ে মারবো—কিন্তু তুমি জীবিত থাকবে। এই কথাটি মনে রেখো।"

"কি বলছিস রে হাড়কুঁড়ে,… [পৃষ্ঠা ৮০০

"আর একটি সর্ত আছে।" রাজা বললেন, "সেতু দুইটি আগামী কাল সূর্যোদয়ের আগেই শেষ করতে হবে।"

"আচ্ছা তাই হবে" বলে হাড়কুঁড়ের মা তখনকার মত বিদায় নিলো।

হাড়কুঁড়ের পক্ষে একাজ মোটেই কঠিন না। পরের দিন সূর্য ওঠার আগে হাড়কুঁড়ে চুণীর আংটি একটু ঘষে মনে মনে প্রার্থনা করলো, সেতু দুইটি যেন এক্ষুণি তৈরী হয়ে যায়।

রাজামশাইও সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ির জানলা খুলে তাকিয়েছেন, অমনি ঝকঝকে সেতু দুইটি তাঁর চোখে পড়লো।

"আমার মেয়ে সত্যি খুব ভাগ্যবতী।" রাজা মনে মনে ভাবলেন। এরপর রাজকন্যার সঙ্গে হাড়কুঁড়ের বিয়ে হয়ে গেল। রাজকন্যাকে বিয়ে করে হাড়কুঁড়ে উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা হলো। সে তখন রানীকে নিয়ে সোনার অট্টালিকায় বাস করতে লাগলো। মাকে একটি সোনার প্রাসাদ গড়িয়ে দিল। আর কুকুর ও বিড়ালকে আলাদা আলাদা ছোট্ট দুইটি সোনার বাড়ি দিলো। এরপর সবাই মিলে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগলো।*

* বর্মাদেশের উপকথা

প্রফেসর প্রিয়নাথ কখনও মারামারি করেন নি — কিন্তু ছেলের বিপদ দেখে তিনি উদাসীন থাকতে পারলেন না — ছুটে এসে তিনি আততায়ীর একটি কান টেনে ধরলেন ...
ধাঁই!
এতক্ষণে ঝামেলা শেষ!
সে কি জয়ন্ত! শুরু না হতেই শেষ দেখতে চাও?
তুমি!

উরা! বিশ্বাসঘাতক! শয়তান — তোমার জন্যই আমাদের এই দুর্দশা…
আমার জন্মভূমির প্রতি আমি বিশ্বস্ত — পৃথিবীর মানুষের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই!… তবে —
কেউ লক্ষ্য করে নি যে মন্দ্রাপের জ্ঞান ফিরে এসেছে … আক্রমণের পূর্ব মুহূর্তে উরা চিংকার করে জয়ন্তকে সাবধান করে দিলে, কিন্তু তখন আর সময় ছিল না…
জয়ন্ত! সাবধান!
আঃ!

(চলবে)

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

ভারী দুর্যোগের রাত। সারা দিন এলোমেলো বাতাস দিচ্ছিল, তার সঙ্গে ছিল ঝিরঝিরে বিষ্টি। সন্ধ্যার পর থেকে ক্রমশঃ বাতাসটাও বেড়ে উঠেছে, বর্ষণেরও দাপট বেড়েছে চতুর্গুণ। রাত দশটা বাজতে না বাজতে সারা গ্রামই নিস্তব্ধ, একটা কুকুর পর্যন্ত ডাকছে না কোথাও।

সেই ঝড়ের মাতামাতি আর হাতির শুঁড়ের মত বৃষ্টিধারার ভিতর দিয়ে রাজগাঁয়ের এক সুড়িপথ দিয়ে একটিমাত্র লোক নিঃশব্দে পথ চলেছে। মেটে পথ, দু'ধারের বেশী অংশই শটিবনে ঢাকা, মাঝখানে একটা সরু জুলি দিয়েই বরাবর লোক চলাচল চলছে, তারই ফলে সেটা আগাগোড়া গর্ত হয়ে গিয়েছে, আজ তা থইথই করছে জলে। পাছে জলের ভিতর দিয়ে চলতে গেলে খলবল শব্দ হয়, তাই সে জীবনের মায়া ছেড়ে দিয়ে পাশের শটিবন ভেঙে হেঁটে যাচ্ছে। এ শটিবন সাপের আড্ডা, দিনের বেলাতেই কোন পথিক ওর ভিতর পা দেয় না।

নিশীথ রাতের অভিযানে যারা বেরোয়, তাদের প্রাণের মায়া করলে চলে না, বংশীও করছে না। কোন্ দেবতার কৃপায় কে জানে, বংশী নিরাপদেই বিপজ্জনক পথটা পেরিয়ে গেল। পৌঁছুলো এসে এক এঁদো পুকুরের পাড়ে। পাড়ের নীচেই বাঁশের বেড়ায় ঘেরা এক ফালি বাগান, বড় গাছের ভিতর কয়েকটা নারকোল গাছ, বাকী জায়গাটা সবই লঙ্কা, বেগুনের গাছ আর একটা লাউ-মাচায় ভর্তি। বংশী লাউয়ের ভারী ভক্ত। লাউ ফলবার

সময় এখনও হয় নি। মধর দেখে গোটা কতক লাউডগা ভেঙে ভেঙে সে একটা তাড়া বেঁধে ফেলল চটপট, আর তাড়াটা মাচার উপর তুলে রাখল যত্ন করে, ফিরবার সময় নিয়ে যাবে।

তারপর বাগান পেরিয়ে বাড়ির কাছে। একটা পুরানো নোনা-ধরা একতলা দালান। দত্তদের বাড়ি এটা। তিনখানা কামরা বাড়িতে, দক্ষিণের কামরায় দত্তবুড়ো ঘুমোয়, তা বিলক্ষণ জানে বংশী। গাঁয়েরই লোক সে, কোনও বাড়ির অন্ধিসন্ধিই তার জানতে বাকী নেই। নিজে বড় কোন বাড়িতেই যায় না, কারণ চোর বলে বদনাম তার অনেক দিনের। তার চর আছে হিমি নাপতিনী, মেয়েদের নখ কাটবার জন্য সব বাড়িতেই সে ঘরের লোকের মত যায় আসে। তার কাছেই সব প্রয়োজনীয় খবর পায় বংশী।

দক্ষিণের কামরার কোণের জানলাটার নীচে বসে সিঁদকাঠি ধরল বংশী। এতক্ষণ এটা তার উরুতে বাঁধা ছিল, চোরেরা সবাই ঐরকম বেঁধে রাখে।

ঝড়ের গর্জন, বৃষ্টির ঝমাঝম, সামান্য খুটখাট শব্দ কি আর কানে যায় ঘরের ভিতরকার লোকের? বংশী একে একে নোনা-ধরা ইট আলগা করে নীচে নামিয়ে রাখছে। প্রথম খানা খুলতেই যা-একটু কষ্ট হয়েছিল, তারপর কাঠির দুই একটা চাড়েই কতকালের পুরানো গাঁথনি ভুসভুস করে শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, পথ পরিষ্কার হয়েছে। সিঁধ যা কেটেছে, তার ভিতর দিয়ে গলে ভিতরে যাওয়া সম্ভব। মানুষও বংশী এমন কিছু গাঁট্টা পালোয়ান নয়।

কিন্তু সিঁধের ভিতর দিয়ে মাথা গলাতেই আলো চোখে পড়ল যে! ব্যাপার কী? এত রাতে ঘরে আলো জ্বলে কেন? ঐ যে! হারিকেন লণ্ঠনটা! কালিঝুলিমাখা চিমনি থেকে আলো আর অন্ধকার সমান সমান ভাগে বেরুচ্ছে।

মাথাটাকে যথাসম্ভব ঘরের ভিতর তুলে ধরে চারিদিকটা বেশ ভাল করে লক্ষ্য করছে বংশী। প্রথমেই চোখে পড়ল কাঠের সিন্দুকটা, তার গায়ে ইয়া রাক্ষুসে তালা। ঐ কাঁঠাল কাঠের সিন্দুকেই দত্তবুড়োর সবকিছু, হিমি নাপতিনী নিশ্চয় করে তাকে বলেছে। ঐ সিন্দুক খুলতে হবে। চাবি? দত্তবুড়োর কোমরে ঘুনসিতে বাঁধা। এমন অনলগোছে খুলে নেবে বংশী, বুড়ো বিন্দুবিসর্গও টের পাবে না। ওস্তাদের কাছে ওসব বিদ্যে ভাল করেই শিখে রেখেছে বংশী। এ কাজে সে নতুন নয়।

কিন্তু গেরো দেখ, নাতনীটা এই ঘরেই শুয়ে আছে মাদুর পেতে। কেন বল দেখি? হিমী তো বলেছে—কুমী পাশের ঘরে শোয়, দুই ঘরের ভিতরকার দরজাটা থাকে খোলা। ব্যস্, ঠাকুরদা আর নাতনী, বাড়িতে তৃতীয় মানুষ আর কেউ নেই। সোনা বলে যে ছেলেটা গরু চরায় আর বাড়ির কাজকর্ম অল্পবিস্তর দেখে, সে সন্ধ্যাবেলায় খেয়ে

নিজের বাড়ি চলে যায়, কারণ বাড়িতেও তার বুড়ী-মা একা থাকে, তাকে ফেলে সোনার মনিববাড়ি রাত্রিবাস করা সম্ভব নয়।

কথা এই, কুমী এ ঘরে কেন? এবং ঐ আঁধারে লণ্ঠনটাই বা অমন করে ধোঁয়া ছড়ায় কেন? তবে কি দত্তবুড়োর অসুখ? তাকে পাহারা দেবার জন্যই এই ব্যবস্থা? গেরো দেখ! একটা মানুষকে নিদালি দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা খুবই সোজা, দুটো হলে একটু শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য অসম্ভব কিছু নয়। মন্তরটা যেখানে তিনবার আওড়ালে হতো, সেখানে তিন তিরিক্ষে নয়বার আওড়াতে হবে।

যা থাকে কুল-কপালে! ওস্তাদের শ্রীচরণ স্মরণ করে বুক পর্যন্ত ঘরের ভিতর এগিয়ে দিল বংশী। মেয়েটা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে খাটের উপর দত্ত বুড়োও, কিন্তু মাঝে-মাঝে এপাশ-ওপাশ করছে বড্ডো। নিয্যস্ অসুখ করেছে ওর, হয়তো জ্বর-টর হয়ে থাকবে কিংবা হয়তো কাশিটা বেড়েছে। থাকগে নিদালি মন্তর ছাড়লে আর বুড়োকে নড়তে চড়তে হবে না।

ঘরের ভিতর উঠে দাঁড়িয়ে বংশী ফিসফিস করে মন্তর ছাড়ছে—

'নিদালি নিদালি ফুসফাস
কুম্ভকর্ণের নাভিশ্বাস।
ঘুমের ছাওতা আসন পাতে
আকাশ বাতাস দুনিয়াতে,
হিং টিং ক্লিং ক্লুং
ভর দুনিয়া অসাড় নিন্দে,
ক্রিং ভ্রিং ভ্রং প্রুং,
মরে থাক যে আছিস জিন্দে,
নিদালি নিদালি নিঃঝুম।

একবার, দুইবার! তিনবারের বার যেই 'ঘুমের ছাওতা' পর্যন্ত পৌঁছেচে বংশী, দত্তবুড়ো বেদম কেশে উঠল—খক্ খক্ খক্কর খক্—

মেঝেতে কুমী চনমন করে উঠেছে, ঘুম ভাঙেনি ঠিক, কিন্তু এই ভাঙে বুঝি—এই ভাঙে বুঝি—

মরিয়া হয়ে বংশী ক্রমাগত আউড়ে যায়—"হিং টিং ক্লিং ক্লুং—ক্রিং ভ্রিং ভ্রং প্রুং—নিদালি নিদালি নিঃঝুম"—

নাঃ, দত্তবুড়ো—চিরকেলে তেজারতির রক্তচোষা ঝানু মহাজন—ওকি আর নিদালিতে বশ মানবে? দ্বিগুণ বেগে সে খক্কর-খক্কর করে কেশে উঠল আবার, আর

ধড়মড়িয়ে উঠে বসে সঙ্গে সঙ্গেই কুমী ছুটে গেল তার কাছে, তার বুকে হাত দিয়ে আকুল হয়ে ডাকতে লাগল—"দাদু! দাদু!"

বংশী পিছিয়ে দাঁড়িয়েছে দেওয়াল ঘেঁষে। নিঃশব্দে একটু একটু করে সরে যাচ্ছে সিঁধের কাছে। সিঁধে একবার পা গলাতে পারলে হয়। এমন ঝকমারিতে সে কোনদিন পড়ে নি। ক্ষয়রুগীর কাশ যে নিদালিতেও বশ মানে না, ওস্তাদ একথা তাকে বলে দেয়নি বলে ভয়ানক রাগ হচ্ছে তার। ওকথা জানা থাকলে সে কি এখানে ঢোকে? দত্তবুড়ো যে ক্ষয়রোগের রুগী, তা এ গাঁয়ে গোপন তো নেই!

কাশতে কাশতে বুড়োর দম বন্ধ হয়ে আসে বুঝি। কুমী ক্রমাগত তার বুকে হাত বুলায়, আর কান্না-ভরা সুরে 'দাদু, দাদু' বলে চেঁচায়। বুড়ো বুঝি পটোল তোলে সত্যিই। হঠাৎ কুমী কাঁদতে কাঁদতে বলে ওঠে "চুনী জেঠাকে না ডাকলেই নয়। কিন্তু এত রাত্তিরে কে যাবে? কাকে পাব?"

বংশী দরজায় জোরে জোরে ঘা দিতে শুরু করল। [পৃষ্ঠা ৮০৮

ছুটে গিয়ে দরজাটা দড়াম করে খুলে ফেলল কুমী। সঙ্গে সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার ঝাপটায় কালি-মাখা লণ্ঠনটা দুই বার দপ দপ করেই তারপর একেবারে নিবে গেল। বংশী ততক্ষণে সিঁধ দিয়ে গলে বেরিয়ে পড়েছে, মুষলধারে বৃষ্টি তার গায়ে মাথায় পড়ছে এসে শতমুখী সড়কির কোপের মত।

বাঁ-হাতে সিঁধ কাঠি, ডান হাত দিয়ে বংশী মাচার উপর থেকে লাউডগার আঁটিটা তুলে নিল। আজকের সওদায় ঐটিই মুনাফা।

বাগান পেরুতে পেরুতে এক একবার কুমীর আওয়াজ পায় সে। ঝড় বৃষ্টির তুমুল মাতামাতির মাঝে সে সমানভাবে চেঁচিয়ে যাচ্ছে—"নিশি খুড়ো! হরিদা! নিশি খুড়ো!" নিশি আর হরি দত্তদের নিকটতম প্রতিবেশী। একজনের বাড়ি বড় বাগানটার ওধারে,

আর একজনের কুঁড়ে তালপুকুরের পাড়ের উপর। ঝড়বৃষ্টি না থাকলে তাদের কানে এ নিশুতি রাতের ডাকাডাকি পৌঁছুতেও পারত হয় তো, কিন্তু এই রাত্রে? কোলের কাছের মানুষের কথা যখন শুনতে পাওয়া শক্ত? কোনও ভরসা নেই।

চুনী জ্যাঠাকে ডাকতে চাইছে কুমী। অর্থাৎ কবরেজ চুনী চাটুজ্যে। খবর পেলেই এই দুর্যোগেও সে ছুটে আসবে, সন্দেহ নেই। কবরেজ খুবই খাতির করে দত্তদের। কিন্তু খবর সে পাচ্ছে কি করে? এদিকে দত্তবুড়োর অবস্থা—যা নিজের চোখেই দেখে এসেছে বংশী—মানে, ওষুধ বিষুধ না পড়লে রাত কাটে কিনা, সন্দেহ।

যে সুড়িপথ দিয়ে সে এসেছিল, সেটাতে পা না বাড়িয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে উঠল বংশী। বাঁয়ে দত্তবাড়ির সদর দরজা। কুমীর আওয়াজ আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এবার। এখনও সে চেঁচিয়ে যাচ্ছে—"হরিদা! নিশি খুড়ো! হরিদা!" —ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙে গেছে মেয়েটার। নেহাত দাদুকে এ অবস্থায় একা ফেলে যাওয়া চলে না, তাই; তা না হলে এই প্রলয় রাত্তিরেও কুমী হয় তো নিজেই ছুটে বেরুত চুনী জ্যাঠার বাড়ির দিকে।

বংশীর একবার ইচ্ছে হল—ডেকে বলে—"তুমি আর চেঁচিও না। আমি যাচ্ছি কবরেজ ডাকতে।" কিন্তু তা আর সে পেরে উঠল না। যদি তার গলা চিনে ফেলে? গাঁয়েরই লোক সে, মাঝে মাঝে কুমী তাকে দেখেও থাকে—আশ্চর্য কি চিনে ফেলবার? না, চলে না। ওকাজ করা মোটেই চলে না। বড়ই আশঙ্কার কথা।

পা চালিয়ে চুনী কবরেজের বাড়িতেই এসে পড়ল বংশী। এবার আবারও সেই সমস্যা। দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে সবাই। রীতিমত ডাকাডাকি না করে কবরেজকে তোলা যাবে না। তারা যদি কেউ বংশীকে চিনে ফেলে? এত রাতে এই দুর্যোগে বংশীবদন হাজরা পথে বেরিয়েছে, এটা দেখলেই তো গাঁয়ের যে কোন লোক তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে যাবে! তার পর দত্তবাড়িতে ঐ সিঁধ! সেটা তো আর বুজিয়ে আসে নি বংশী! ধরা পড়বার আর বাকী থাকবে নাকি কিছু? আগে দুই দুইবার শ্রীঘর ঘুরে আসতে হয়েছে। এবার ঠেলবে অন্ততঃ তিনটি বচ্ছর।

চুনী কবরেজের বাড়ির দরজায় সেই আকাশভাঙ্গা বৃষ্টির নীচে ঠায় দাঁড়িয়ে বংশী। অন্ততঃ পাঁচটা মিনিট। কী করবে সে? নিঃশব্দে নিজের বাড়ি গিয়ে কাঁথা মুড়ি দেবে? তাতে সে নিরাপদ হতে পারে বটে, কিন্তু দত্তবুড়োটা মরবে, এবং সেই মড়া আগলে একা বাড়িতে চৌদ্দ বছরের মেয়ে ঐ কুমীটা দুঃখে আর ভয়ে আধমরা হয়ে থাকবে, সন্দেহ নেই।

সেই পাঁচ মিনিট পরে হঠাৎ যেন একটা ঘুমের চটকা থেকে জেগে উঠল বংশী। আর দরজায় জোরে জোরে ঘা দিতে শুরু করল। ঝন ঝন ঝনাৎ করে উঠছে কাঠের দরজা, খুব মজবুদ কাঠামো না হলে ভেঙেই পড়ত বুঝি!

পাঁচ সাত বার ঐরকম ঝন ঝন ঝনাৎ শব্দ হতেই রাতের সুখ নিদ্রা ও ভেঙে গেল চাটুজ্যে পরিবারের। বিভিন্ন ঘর থেকে বিভিন্ন লোক সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—"কে? কে? কে?"

"দত্তবাড়ির বড় কত্তা যায়-যায়। কবরেজ মশাই এক্ষুণি যান, এক্ষুণি!"

"বড় কত্তা? কিন্তু তুমি কে?"

"তুমি কে"—এ প্রশ্নের উত্তর সযত্নে এড়িয়ে গিয়ে বংশী তার খবরটাকেই আর একবার জোরগলায় আউড়ে গেল, কী জানি প্রথম বারের কথাটা পুরোপুরি যদি না-ই বুঝতে পেরে থাকে ওরা! যে ঝড় বৃষ্টির বোঁ বোঁ সাঁ সাঁ আওয়াজ!

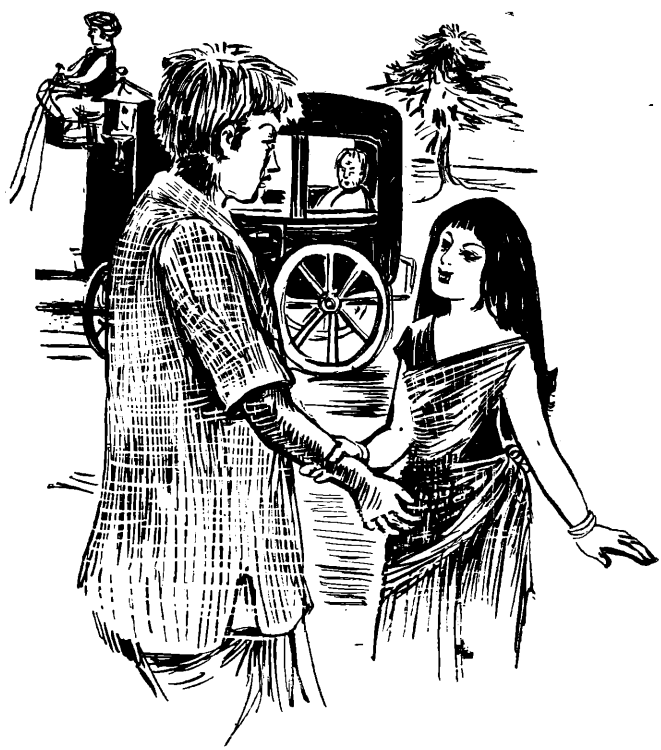

কুমী এসেই তার হাত ধরে টানতে টানতে বলল— [পৃষ্ঠা ৮১০

"দত্তবাড়ির বড়কত্তা যায় যায়। কবরেজমশাই এক্ষুণি যান, এক্ষুণি।" গানের ধুয়োর মত বারবার কথাটা আবৃত্তি করতে করতে বংশী ক্রমশঃ দূর থেকে দূরান্তরে মিলিয়ে গেল।

দুই এক মিনিটের মধ্যেই আলো, লাঠি আর ছাতা নিয়ে তিনটি লোক বেরুলো চাটুজ্যে বাড়ি থেকে। দত্তমশাইয়ের মরণাপন্ন অবস্থার কথা শুনে না যাওয়াও চলে না, আবার কবরেজমশাইকে এ-রাত্রে একা ছেড়ে দিতেও বাড়ির লোক নারাজ, বিশেষ যখন ঐ লোকটা নিজের নাম বলল না কিছুতেই।

কাজেই কবরেজের সঙ্গে গেল এক ছেলে আর এক ভাইপো।

পরের দিন সকালেই লাউডগা সিদ্ধ ভাত নামিয়ে খেতে বসল বংশী। ইচ্ছেটা এই যে খেয়ে নিয়েই মুকুন্দপুর চলে যাবে ওস্তাদের কাছে। নিদালি মন্তর ক্ষয়রুগীর উপর খাটে না কেন, সেইটেও জানা হবে, আর এদিকে যদি কোন গোলযোগ বাধে কালকের সিঁধ-কাটা

নিয়ে, খবর পাওয়া যাবে মুকুন্দপুরে বসেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা, অর্থাৎ গা-ঢাকা দেওয়া যাবে দিনকতকের জন্য।

কিন্তু দফাদার কানাই সামন্ত হুঁশিয়ার লোক। বংশীকে এসে পাকড়াল, সিদ্ধ লাউডগা পাতে থাকতে থাকতেই। "এ লাউডগার গায়ে যে দত্তবাড়ির গন্ধ লেগে রয়েছে বংশী ভাই!"

বংশী জবাব না দিয়ে ভাতটা উদরে চালান করতে লাগল তাড়াতাড়ি। যেতে যে হবেই, তা তো বুঝতেই পারা যাচ্ছে। এই বেলা পেটটা পুরে নিতে না পারলে সারা দিন কষ্ট পেতে হবে। থানায় আর তাকে খাওয়াচ্ছে কে।

ব্যাপারখানা এই—কাল রাত্রে কবরেজ গিয়ে মকরধ্বজ মাড়ছেন এদিকে, তাঁর ছেলে আর ভাইপো সিঁধ আবিষ্কার করে ফেলেছে ততক্ষণ। তারাই হইচই করে উঠল, তারাই আলো নিয়ে লাউমাচার নীচে এসে বংশীর পায়ের দাগ পেল কাদামাটিতে। রাত ভোর হবার আগেই দফাদারকে গিয়ে খবর দিল তারা। দফাদার জানে এ গাঁয়ে দাগী চোর এক বংশী হাজরা ছাড়া কেউ নেই, তাই তার প্রথম কর্তব্যই হল বংশীর বাড়িতে হানা দেওয়া। হাতে নাতে বামাল গ্রেফতার—লাউ-ডগা ওর পাতে। সে দেখে এসেছে সদ্য-কাটা লাউলতার মুখ দিয়ে তখনও রস ঝরছে দত্তবাড়িতে।

অবশ্য লাউডগা সে থানায় নিয়ে দেখাতে পারল না দারোগাবাবুকে, বংশী তা গোগ্রাসে গিলে ফেলেছে আগেভাগেই।

বিচারে বংশীর মাত্র তিন মাস জেল হল, যেখানে সে তিন বছর আশা করেছিল। তার কারণ দত্তবাড়ি থেকে কোন এজাহারই আসে নি। দত্তবুড়োর যখন ব্যাপারটা ভাল করে বুঝবার মত অবস্থা হল, তখন তিনি বললেন—"আমার তো চার-ছয় গাছা লাউডগা ছাড়া কিচ্ছু খোয়া যায় নি, আমি কেন ঝামেলা করতে গেলাম?"

তিন মাস পরে জেলখানা থেকে বেরিয়ে বংশী ভাবছে—এইবার তা হলে ওস্তাদের কাছে গিয়ে কথাটা জেনে আসি। মুকুন্দপুরের রাস্তা ধরবে ধরবে করছে, এমন সময় একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসে থামল তার সামনে, জানলা দিয়ে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকলেন খোদ দত্তবুড়ো। বংশী দেখল—বুড়োর শরীরটা যেন আগের চেয়ে অনেক ভাল।

কিন্তু তিনি বংশীকে ডাকবেন কেন? অবাক্ হয়ে বংশী কিংকর্তব্য ভাবছে, এমন সময়ে দরজা খুলে ছুটে নেমে এল কুমী, এসেই তার হাত ধরে টানতে টানতে বলল—"দাদু বললেন—সে রাত্রে যে কবরেজ ডেকে দিয়েছিল, সে তুমি ছাড়া কেউ না। আজ থেকে তুমি আমার দাদা।"

সেই থেকে বংশী সত্যিই কুমীর দাদা বনে গিয়েছে। দত্তবাড়িতেই থাকে, দত্তবাড়ির আর দত্তবুড়োর তদারকি করে, আর সাধ মিটিয়ে লাউডগা আর লাউঘণ্ট খায়।

———

● শহীদ স্মৃতিকথা

কাশেল উধম সিং

রঞ্জন মিত্র

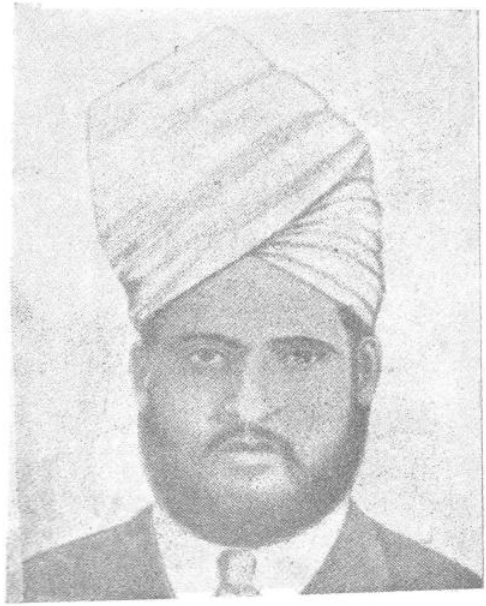

"ভারতে ফেরো! ভারতে ফেরো!"—বিষ্ণু গণেশ পিংলের উদাত্ত আহ্বান সাড়া জাগিয়ে তুলল মার্কিন-কানাডার প্রবাসী ভারতীয় সমাজে—"ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু করতে হবে ভারতেরই মাটিতে—"

কথা ঠিক। প্রথমে তারক দাস, তারপরে খাকোঁজি-কাশীরাম, তারও পরে হরদয়াল-পিংলে গদরের ত্রিমহাদেশব্যাপী মহা-আন্দোলন সমভাবেই পরিচালনা করেছেন। আগুন জ্বলে উঠেছে হাজার বিপ্লবী তরুণের অন্তরে অন্তরে। সে আগুনের শিখা ভারতীয়দেরই দগ্ধ করেছে এ-যাবৎ, ইংরেজের অভ্রংলেহী ক্ষমতার সৌধে তার আঁচ লেগেছে সামান্যই।

গদর নেতারা তাই এবার মনস্থ করেছেন—বিপ্লবকে পাঠিয়ে দিতে হবে ভারতের অভ্যন্তরে। মার্কিনদেশে যারা ভারতীয় বিপ্লবী রয়েছে, তাদের বেশির ভাগই পাঞ্জাবের লোক, জাত্যংশে শিখ। কাজেই ওদের পাঠানো দরকার পাঞ্জাবেই। বাংলায় ত সন্ত্রাসবাদের আগুন জ্বলছেই। সেই বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারের পর থেকেই। এবার পাঞ্জাবেও জ্বলুক আগুন। সে আগুনের ইন্ধন যোগাবার ভার নিয়েছে জার্মান-সরকার।

কাইজারের জার্মানি মহাযুদ্ধে নেমেছে ইংরেজের বিপক্ষে। ভারতেই ইংরেজের জগৎজোড়া সাম্রাজ্যের সবচেয়ে সুদৃঢ় শক্তিকেন্দ্র। সে শক্তির উৎস কিন্তু গোরা ইংরেজ নয়, কালা ভারতীয়দের দেহাস্থি পুঞ্জীভূত করে করে সাম্রাজ্যের ইমারত গড়ে তুলেছে ইংরেজ।

জার্মানি পরামর্শ দিয়েছে—"ঐ ভারতীয়দের হাতে দাও অস্ত্র। জার্মানির অস্ত্রে ইংরেজকে ঘায়েল করুক ভারতের সন্তান। বোমা বারুদ বন্দুক কামান—যত চাও আমরা দেব। সৈনিক যোগাও তোমরা—"

তাই বিষ্ণু গণেশ পিংলের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে দেশে দেশে—"যেখানে যত প্রবাসী ভারতীয় রয়েছে, ফিরে চল মাতৃভূমির কোলে—"

চলেছে তারা। ছাত্র বেরিয়ে এসেছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, কারিগর বেরিয়ে এসেছে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষানবিসী ছেড়ে। দলে দলে শতশত বিপ্লবী ভারতে ফিরে যাচ্ছে। পিংলে ব্যবস্থা করেছে বিভিন্ন জাপানী জাহাজ কোম্পানির সঙ্গে—এই সব প্রবাসীকে তারা পৌঁছে দেবে কলকাতা বন্দরে। ছোট ছোট দলে ভাগে ভাগে নিয়ে যাবে এদের। এক জাহাজে বেশী সংখ্যায় যাবার চেষ্টা করলে দশা হবে কোমাগাতামারুর মতই। প্রশান্ত মহাসাগরের বুকেই সে জাহাজ আটক করে ইংরেজ নৌবাহিনী ভারতীয় যাত্রীদের ফেরত পাঠাবে আমেরিকায়।

ছয়খানা জাহাজ এল প্রথম কিস্তিতে, তাদের মধ্যে তোসামারুও একটি। জনা-কুড়ি পাঞ্জাবী যুবক যাত্রী হলো এতে, সানফ্রান্সিস্কো থেকে। এই কুড়িজনের ভিতর এক স্বল্পভাষী দীর্ঘদেহ যুবককে কার্যতঃ নেতা বলে মেনে নিয়েছে অন্য সবাই। নাম এর উধম সিং। ঐ নামেরই আর এক কৃতী পুরুষ স্বাধীনতার যুদ্ধে আত্মবলি দিয়েছেন ইতিমধ্যে, তাঁর সঙ্গে পার্থক্যটা যাতে সহজেই উপলব্ধি হয়, তাই এই উধম সিংকে সাথীরা ডাকে কাশেল বলে। শব্দটা গোড়ায় ছিল 'কুশেল'। হিন্দুকুশের উপত্যকা থেকে এই উধম সিংয়ের ঠাকুরদা এসে শতদ্রুর তীরে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তাই কুশেল-উপাধি তাকে স্থানীয় অধিবাসীরাই দিয়েছিল। সেই কুশেলেরই অপভ্রংশ এই এ-যুগের কাশেল।

শতদ্রুকূলের বীর গাঁওয়ে জন্ম এবং শিক্ষা উধম সিংয়ের। সে শিক্ষা অবশ্য স্কুল-কলেজের শিক্ষার মতো নয়। গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য গুরুমুখীর পাঠ, আর পিতার কাছে তরোয়াল-বর্শার হাতে-খড়ি। বয়স যখন বছর বারো, দূরসম্পর্কের এক আত্মীয় তাকে নিয়ে গেলেন কুইবেক। সেখানে তাঁর কাঠের কারবারে কর্মচারী দরকার। উধমকে তিনি শিখিয়ে পড়িয়ে নিজের যোগ্য সহকারী করে নেবেন।

বৎসর পাঁচ-ছয় কাটল সেই কাঠের কারবারে। এই সময়টা সে শুধু কাঠের মাপ আর দরদাম শিক্ষায় ব্যয় করেনি, অন্য দিক দিয়েও সদ্ব্যবহার করেছে এর। ইংরেজী শিখেছে, ফরাসীভাষা শিখেছে, দুটো ভাষাই সমান চালু কুইবেকে। আর শিখেছে বন্দুক-পিস্তলের ব্যবহার।

তারপর তার পরিচয় হলো গদর পার্টির কতিপয় কর্মীর সঙ্গে। কানাডায় তো গদরের হাজার প্রচার কেন্দ্র!

বিষুণ সিং বয়সে প্রৌঢ়, বিষয়কর্মের দিক দিয়ে ঠিকাদার। ঠিকাদারী কাজে

কাঠ দরকার হয়ে থাকে অনেক, সেই কাঠ কিনবার জন্যই উধমদের গোলায় যাতায়াত তাঁর। উধমকে তিনি সুযোগসুবিধামত বিপ্লববাদে দীক্ষিত করে নিলেন, গদর-পত্রিকা নিয়মিত পড়বার সুযোগও করে দিলেন তিনিই।

ফলে, কিছুদিন পরেই আত্মীয় মহাশয়ের কাছে দুই মাসের ছুটি নিয়ে উধম সিং মার্কিনমুলুকে বেড়াতে গেল। সেই যে গেল, আর সে কানাডায় ফিরল না।

১৯১৪ সাল। মহাযুদ্ধের তাণ্ডবে দুনিয়া থরহরি কাঁপছে। ভাগ্যিস তোসামারু জাপানী জাহাজ! জাপান এ যুদ্ধে ইংরেজের মিত্র ও সহযোগী, তাই নির্বিবাদে তোসামারুকে কলকাতায় পৌঁছোতে দিল ইংরেজ নৌবাহিনী। কিন্তু খোঁজ নিচ্ছে তারা। খবর পেয়েছে যে পাঞ্জাবী যুবক প্রায় দুই ডজন আছে এই জাহাজে।

গদরের খবর ভালরকমই রাখে ভারত সরকার। যুবকেরা যখন পাঞ্জাবী, তখন তারা যে গদরের সদস্য, একথা বোধ হয় হলপ নিয়েই বলা যায়। আর গদরের সদস্যকে ত ভারতের বুকে দড়ি-ছেঁড়া অবস্থায় চরে বেড়াতে দেওয়া যায় না!

উধম সিং কাশেল আর তার বন্ধুরা কলকাতার জেটিতে নামা মাত্র দেখতে পেল যে তাদের সমাদরে বরণ করে নেবার জন্য ইংরেজের পুলিস সদলে হাজির সেখানে। প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদের অজুহাতে তাদের নিয়ে যাওয়া হলো লালবাজারে, সেখানে জানানো হলো যে তারা বন্দী।

লালবাজারের হাজতখানায় বেশ কিছুদিন আবদ্ধ থাকার পর তাদের চালান দেওয়া হলো পাঞ্জাবে। দলবদ্ধভাবে যেতে পেল না তারা, আলাদাভাবে এক একজনকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো এক এক দিন। এই সহযাত্রীদের কারও কারও সঙ্গে আবারও দেখা হয়েছিল কাশেলের। কিন্তু ভারতের মূল ভূখণ্ডে নয়, সাগরপারের আন্দামানে।

লাহোরে পৌঁছোবার পরে দেশের বাড়িতে অন্তরীণ হল কাশেল। সেখানে পিতা তখন স্বর্গতঃ। ভাইয়েরা প্রসন্ন হলো না উধমের হঠাৎ আবির্ভাবে। দুটো কারণ তার। তারা ধরেই নিয়েছিল যে উধম আর দেশে ফিরবে না, পৈত্রিক জায়গাজমির ভাগও দাবি করবে না। এখন ত দেখা যাচ্ছে ওর প্রাপ্য অংশটা উগরে দিতে হয়।

দ্বিতীয় কারণটা আরও জোরালো। ও স্বাভাবিকভাবে আসে নি, এসেছে রাজবন্দী হয়ে। ভয়ানক ব্যাপার নিশ্চয়ই। পুলিস আসে, রাত দুপুরে হাঁকাহাঁকি করে জানতে চায়—উধম সিং ঘরে আছে কিনা। লজ্জার কথা। কাশেলরা সম্মানী বংশ। তাদেরই বাড়ির একজনকে চোর ডাকাতের পর্যায়ে ফেলে যদি পুলিস, তারা সমাজে মুখ দেখায় কেমন করে?

আকারে প্রকারে ভাইয়েরা হয়ত মনের কথা প্রকাশই করে ফেলেছিল খানিকটা। উধম

সিংয়ের আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগল। সে গৃহত্যাগ করল ভাইদের না বলেই। থানায় শুধু খবর দিয়ে গেল—আমি লাহোরে যাচ্ছি।

অন্তরীণের আসামী নিজের খোসখেয়ালে লাহোর চলে যাচ্ছে, এ আবার কী রকম কথা? পুবের সূর্য কি পশ্চিমে উঠছে আজকাল? ইংরেজ রাজত্ব কি উঠে গিয়েছে এদেশ থেকে? পুলিস লাহোরে এত্তেলা পাঠাল।

উধম কিন্তু লুকোছাপার দিক দিয়েও যায় নি। লাহোরে গিয়েই পুলিসকে খবর দিয়েছে নিজের উপস্থিতির। "নিজের বাড়িতে আমি থাকব না। অন্য যেখানে খুশী রাখতে পার আমাকে—" সাফ জবাব তার।

পাঞ্জাবের পুলিস এমন বেয়াড়া লোক দেখে নি আগে। সাধারণতঃ অন্তরীণ আসামীরা নিজের বাড়িতে থাকতে পেলে পরম সৌভাগ্য বিবেচনা করে। এই লোকটাই এমন উলটো গাইছে কেন? তা বেশ, থেকে ওর দরকার নেই নিজের বাড়িতে। পরের বাড়িতে বা পুলিসের বাড়িতে থাকার কেমন মজা, দেখুক একবার।

বিষ্ণু গণেশ পিংলে এদিকে পাঞ্জাবে এসে পড়েছে নিজেও। তাকে পুলিস গ্রেফতার করতে পারে নি কলকাতায়। কারণ পথেই সে জাহাজ থেকে নেমে পড়েছিল রেঙ্গুনে পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে। তারপরে রেঙ্গুন থেকে হাঁটা পথে চলে গিয়েছিল আসাম। সেখান থকে ছদ্মবেশে রেলপথেই চলে এসেছে লাহোরে।

উধম সিংকে আপাততঃ অন্তরীণ করা হয়েছে লাহোরেরই একটা বাগানবাড়িতে। স্থায়িভাবে থাকবার জন্য ওকে কোথায় পাঠানো যায়, এখনও মনস্থির করতে পারে নি পুলিস।

বাগানবাড়ি থেকেই পিংলের সঙ্গে যোগাযোগ করল উধম সিং। তারপর একদিন উধাও হল কাউকে কিছু না বলে।

দিন পনেরো পরেই একটা ব্যাঙ্ক-ডাকাতি। পুলিস কোন সূত্রে খবর পেয়েছিল আগে থেকেই। প্রস্তুত ছিল তারা। ডাকাতি করতে এসে একটা খণ্ডযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল ডাকাতেরা। কয়েকজন পালাতে সক্ষম হল বটে, কিন্তু জনা পাঁচ ছয় জখম হয়ে ধরা পড়ে গেল। এদেরই মধ্যে একজন হল উধম সিং কাশেল।

ব্যস, এবারে আর উধমের বাসস্থান নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার রইল না পুলিসের। বিচারাধীন আসামী বলে লাহোর জেলেরই হাজতে তাকে রেখে দেওয়া হল কয়েক মাস।

কয়েক মাস রাখতে হল এই জন্য যে ব্যাঙ্ক-ডাকাতিটাকে একটা বিচ্ছিন্ন অপরাধ বলে মেনে নিতে নারাজ ছিল পুলিস। তাদের মতে এটা ধারাবাহিক অপরাধপরম্পরার একটা অঙ্গ।

এটার উপলক্ষে ধরা যারা পড়েছে, তারা সবাই রাজদ্রোহী বিপ্লবী, ভারত থেকে ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদকামী। এদেরই ঝাড়ে-বংশে উৎখাত করবার জন্য এক দফা

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা হাইকোর্টে জুড়ে দিয়েছে পুলিস, এবং তারই আনুষঙ্গিক বা পরিপূরক হিসাবে আরও এক দফা দায়ের করবার তোড়জোড় চালাচ্ছে পরম উৎসাহে!

পুলিস অতঃপর সেই পরিপূরক ষড়যন্ত্র মামলার আসামী-তালিকায় ঢুকিয়ে দিল কাশেল আর তার সহকর্মীদের নাম। মামলার বিচার হলো যথাসময়ে। কাশেলের উপর দণ্ডাজ্ঞা প্রচার হলো আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

পোর্টব্লেয়ারের সেলুলার জেলে চালান হয়ে এল কাশেল। দ্বীপান্তরের আসামী, তাতে হয়েছে কী! কাশেলের তেজ এক তিলও কমে নি কারাগারে এসে। জেলার ওয়ার্ডারদের সে বিবেচনা করে কৃপার পাত্র, ঘৃণ্য জীব। একদিন প্রকাশ্য সংঘর্ষ বেধে গেল।

এক কয়েদী দিনের শেষে পুরো খাটুনি দিতে পারে নি। নারকেল থেকে আঁশ বার করার কাজ তার, তিন সের দেবার কথা, দিয়েছে মাত্র দেড় সের। জেলারের সমুখে হাত দুখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলল—"দেখুন সাহেব—"

জেলার তো দেখলই, দেখল কাশেলও। সে সমুখেই হাজির ছিল নিজের কোন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে।

দেখল যে কয়েদীটার দু'খানা হাতের তেলো থেকে বিলকুল চামড়া উঠে গিয়েছে, রক্তে দুটো ঘা ছয় ইঞ্চি লম্বা তিন ইঞ্চি চওড়া।

যে কোন লোকই সে অবস্থায় রেহাই দিত কয়েদীটাকে, কিন্তু গোরা জেলার দিল না। ওয়ার্ডারের হাত থেকে বেটন কেড়ে নিয়ে বেদম পিটতে শুরু করল, এক এক ঘা মারে আর এক একটা হুংকার ছাড়ে—"খাওয়ার বেলায় ত কম খাচ্ছিস না, কাজের বেলাতেই ফাঁকি?"

এ কয়েদী কাশেলের দলের লোক নয়, আগে কোনদিন একে হয়তো চোখেও দেখে নি। কিন্তু চোখের সামনে এর উপর এই নির্যাতন দেখে সে চুপ করে থাকতে পারল না. জোর-গলায় হেঁকে উঠল—"তুমি করছ কী, জেলার? মানুষ তুমি, না জানোয়ার?"

নির্মেঘ আকাশ থেকে অকস্মাৎ সেই মুহূর্তে বজ্রপাত হতো যদি জেলারের সমুখে, সে এতখানি স্তম্ভিত হতবাক্ হতে পারত না তাতেও। দুই মিনিট সে কথাই কইতে পারল না, তারপর সে লাফিয়ে উঠল, আর ওয়ার্ডারদের হুকুম দিল—"মারতে মারতে একে নিয়ে যাও। হাত-কড়ি লাগাও দেয়ালের সঙ্গে—"

"তোমার সে এক্তিয়ার নেই।" পালটা গর্জন করল কাশেল—"সাজা দেবার মালিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—"

কিন্তু জেলারের ইঙ্গিতে ওয়ার্ডারেরা এগিয়ে এসেছে বেটন উঁচিয়ে। তাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কাশেল লাফিয়ে পড়ল জেলারেরই উপরে। ঘুষির উপরে ঘুষি মেরে

তার নাক মুখ চোয়াল ভেঙে রক্তারক্তি করে ফেলল। এদিকে ওয়ার্ডারেরা পিটিয়ে যাচ্ছে তাকে, কিন্তু জেলারকে মুক্ত করতে পারছে না কাশেলের কবল থেকে!

শেষ পর্যন্ত অবশ্য বেদম মারই খেতে হলো কাশেলকে। সেল-বন্ধও হতে হলো, কিন্তু জেলারও ভয়ে কুঁকড়ে গেল এই ঘটনার পরে। রাজবন্দীদের সেলুলার জেলে রাখা জেল-শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর, এই মর্মে গবর্নমেণ্টের কাছে রিপোর্ট পাঠালে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

সেই রিপোর্টের দরুনই কিনা বলা যায় না, কিন্তু কিছুদিন পরেই গবর্নমেণ্ট আদেশ দিলেন—সেলুলার জেলে আর রাজবন্দীদের পাঠানো হবে না! ওদের এক একজনকে এক এক জেলে রাখা হবে, ভারতের ভিতরেই। সব রাজনৈতিক বন্দীরা অতঃপর স্থানান্তরিত হলো ভারতীয় জেলে। কাশেলকে রাখা হলো বেলারি জেলে।

বেশী দিন নয়, জেল ভেঙে পালাল কাশেল।

প্রথমে পাঞ্জাবে, পরে পাঞ্জাব থেকে সীমান্ত পেরিয়ে একেবারে কাবুলে। সেখানে বসে একটা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করতে লাগল গুরুমুখী ভাষায়, নাম তার 'কীর্তি'। কাগজখানার ইংরেজ-বিদ্বেষী সুর আর অগ্নিগর্ভ বয়নে কাবুলের ব্রিটিশ রাজদূতকে করে তুলল বিচলিত। তিনি কাবুল সরকারের কাছে দাবি করে বসলেন যে, কাশেলকে গ্রেফতার করে ভারত সরকারের হাতে অর্পণ করতে হবে।

কাবুল-সরকারের উভয় সংকট। ইংরেজকে রাগিয়ে দেওয়া সুবুদ্ধির কাজ হবে না। আবার ভারতবাসীর স্বাধীনতা-আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতেও তাঁরা ইচ্ছুক নন। বাধ্য হয়ে তাঁরা পরামর্শ দিলেন কাশেলকে—"তুমি কাবুল ছেড়ে যাও—"

এর পরে এই অক্লান্তকর্মী পুরুষসিংহ একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন। কাবুলবাসী ভারতীয়দের ধারণা ছিল এই রকম যে রুশিয়া-যাত্রার পথে কোন অজ্ঞাত স্থানে রোগে ভুগেই হোক, বা আততায়ীর আঘাতেই হোক, ভারতের এই বীরসন্তান বীরগতি লাভ করেছেন।

---

৭৯৭ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর

১ বাক্স ১ জগ ১ কুঁজো ১ বাটি ১ বল ১ ছাতা ১ সসপ্যান ১ গামলা ১ ঘুঁড়ি ১ লাট্টু ১ ডাম্বল ১ হুলাহপ ১ ক্রিকেট ব্যাট ১ ক্রিকেট বল।

বুদ্ধি যার বল তার

লক্ষ্মীকান্ত ঘোষ

আকবরের দরবার থেকে আফগানিস্থানে বেড়াতে গিয়েছেন দেওয়ান বীরবল। তাঁর অনেকদিনের ইচ্ছা দেখবেন প্রতিবেশী রাজ্য আফগানিস্থানকে। দেখবেন তার পাহাড়-নদী, সবুজ ক্ষেত, বিশাল অরণ্যানী। আর দেখবেন তার নতুন নতুন শহর, সুবিশাল রাজপথ, দেব-দেবীর মন্দির, মসজিদ, সেখানকার সহজ-সরল মানুষ, ফুল-ঘেরা শান্ত গ্রাম আর সাহিত্য-সংস্কৃতিময় প্রাচীন ঐতিহ্য।

সত্যি আফগানিস্থানকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গেছেন দেওয়ান বীরবল। দু'চোখ ভরে দেখার সাধ কিছুতেই তাঁর আর মিটছে না। যতই দেখছেন ততই যেন দেখার সাধ আরও বাড়ছে। মুগ্ধতায় মুগ্ধতা বেড়ে যায়। শুধু দেখেই তৃপ্তি পান নি—সঙ্গে সঙ্গে জানার আগ্রহও প্রবল হ'য়ে উঠছে। জানতে চান আফগানিস্থানের প্রকৃত ইতিহাস। যা দেখেন জিজ্ঞেস করেন, এটা কি? ওটা কি? এর নাম কি? এ নামের সার্থকতা কোথায়? কে এই শহরের নাম রেখেছিল? কিসের মন্দির? এই মন্দির বা মসজিদ কত প্রাচীন? প্রতিষ্ঠাতা কে? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পথচারীরা উত্তর দেয়। যতটুকু জানে, ততটুকুই বলে।

কিন্তু সন্দেহ বেড়ে যায় বীরবলের প্রতি। তাই তো, এত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করার দরকার কি? গুপ্তচর নয় তো? হ্যাঁ, সন্দেহ আরো বেড়ে চলল। দু-চারজন মিলে শলা-পরামর্শও করল, লোকটার উদ্দেশ্য কি? কি চায় ও? বিদেশী লোক কখন কি করে বসবে বলা যায় না। এভাবে ঘোরা-ফেরা করতে দেওয়া উচিত নয়। ওকে আমীরের কাছেই নিয়ে চলো।

যে ভাবা তাই কাজ। বীরবলকে ধরে নিয়ে যাওয়া হলো আমীরের কাছে। তার বিরুদ্ধে যা যা নালিশ আর সন্দেহের কারণ সব জানানো হলো।

আমীর সব কিছু শুনে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথা থেকে এসেছ?

বীরবল সহাস্যে বললেন, আমি দিল্লীতে থাকি। আফগানিস্থান বেড়াতে এসেছি। মহামান্য সম্রাট্ আকবরের দরবারেও আমার যাতায়াত আছে।

শুনেই অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠলেন আমীর। কি? আমার সামনে আকবরের গুণ-কীর্তন? আমার রাজত্বের সঙ্গে তার রাজত্বের তুলনা?

ছি! ছি! কি বলছেন জনাব? আপনার রাজত্বের সঙ্গে তাঁর রাজত্বের তুলনা? এ যে আসমান-জমিন্ ফারাক্! সবিনয়ে বললেন বীরবল।

তবে? গর্জে উঠেন আমীর।

বীরবল একটু আশ্বস্ত হ'য়ে ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে বলেন, আপনার রাজত্ব তো পূর্ণচন্দ্র আর শাহান শা আকবরের তো সবেমাত্র প্রতিপদ। কি জানেন, একটু নুন খাই তো; তাই একটু গুণ গাইতে হয়!

উত্তর শুনে খুশী হলেন আমীর। গর্বে বুক ফুলে উঠল। মুক্তি দিলেন বিদেশী পর্যটক বীরবলকে।

আফগানিস্থান ভ্রমণ শেষ করে দিল্লীতে ফিরে গেলেন বীরবল। বন্ধু-বান্ধবদের শোনালেন তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। আর বললেন তাঁর বন্দীদশার কথা। কি করে মুক্তি পেলেন তাও জানালেন। সত্যি সেদিন যদি বীরবলের এ উপস্থিত বুদ্ধি না থাকতো কি যে হতো! হয় মৃত্যুদণ্ড, না হয় আজীবন কারাবন্দী! বন্ধুরা শুনে কেউ প্রাণ খুলে হাসল। কেউ প্রশংসা করল। কারও হিংসায় মুখ বাঁকল, চোখ ঘুরল।

রাজ্যে খলের অভাব নেই। কথা গিয়ে উঠল সম্রাট্ আকবরের কানে। রাজ-দরবারে ডাক পড়ল বীরবলের।

সম্রাট্ আকবর জিজ্ঞেস করলেন, বীরবল, তুমি আমার দেওয়ান। তুমি আফগানিস্থানের আমীরের কাছে আমার কুৎসা করে এলে! তুমি বলেছ তাঁর রাজত্ব পূর্ণচন্দ্র আর আমার রাজত্ব প্রতিপদ। জানো, এই উক্তির জন্য তোমার কি শাস্তি হতে পারে?

বীরবল একটুও ভয় পেলেন না। বললেন, আপনার মতো বুদ্ধিমান সম্রাটেরও যদি ভুল হয় তা হলে আর কি বলব সম্রাট্। আমীরের রাজত্ব তো সত্যই পূর্ণচন্দ্র। তাঁর তো পূর্ণই হ'য়ে গেছে। এবার তো কমবার পালা। আর আপনার তো সবেমাত্র প্রতিপদ। এখনও যে তের কলা বাড়বে!

শুনে খু—উ—ব খুশী হলেন আকবর। প্রাণ খুলে হো-হো ক'রে হাসলেন। কি বলে যে প্রশংসা করবেন বীরবলের ভেবে পান না। শুধু শাস্তি হতে মুক্তি নয়; আনন্দে বীরবলকে জড়িয়ে ধরলেন গভীর আলিঙ্গনে।

বীরবলেরও ঠোঁটে হাসি উপচে পড়ে।

বুদ্ধি কি না পারে! সামান্য একটু কথাতেই দু-দুবার মুক্তি পেলেন বীরবল। বুদ্ধি থাকলে রাজা-গজাদের এমনিই ভুলানো যায়! শুধু কি তাই? বুদ্ধির জোরে যেখানে সূচ গলে না সেখানে লাঙলের ফলাও গলানো যায়!

মাতৃপূজা

বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী

১৯৬৫ সাল, ৫ই সেপ্টেম্বর। ভারত-পাকিস্তানে তখন চলছে তুমুল যুদ্ধ। ছাম্ব এলাকার উপর আশি-নব্বুইখানা শক্তিশালী ট্যাঙ্ক, অগণিত ভারী ভারী কামান, সাঁজোয়া গাড়ি আর হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে দুর্বার বেগে পাকিস্তান আক্রমণ করছে শান্তিপ্রিয় ভারতকে, আর ভারত চেষ্টা করছে এই আক্রমণ প্রতিহত করতে। ভারতের তুলনায় পাকিস্তানের সৈন্যসংখ্যা ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম অনেক বেশী। সুতরাং এমন অবস্থায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাই ৫ই সেপ্টেম্বর বিকালে আমাদের এক বিমান-ঘাঁটিতে বেতারে খবর এলো ঃ "হ্যালো হাণ্টার স্কোয়াড্রন! হ্যালো! আর সময় নেই, হ্যালো! এক্ষুণি আকাশে ওড়ো। ছাম্ব এলাকার শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করো! যেমন বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে! হ্যালো!"

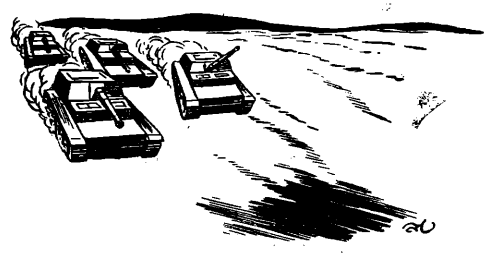

এই খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গেই যে প্রথম দৌড়ে গিয়ে প্লেনের ককপিটের ডালা খুলে বসলো সে আর কেউ নয়—আমাদেরই বাংলামায়ের ছেলে, ফ্লাইট লেফটেনাণ্ট তপন চৌধুরী। তপন বসতেই জেট ইঞ্জিন গর্জে উঠলো গোঁ গোঁ করে। যেন রাগে শত্রুপক্ষকে পিষে ফেলতে চায়। তৎক্ষণাৎ আরো জোরে শব্দ করতে করতে বিমানঘাঁটির রানওয়ের ওপর দিয়ে খানিকটা গিয়েই হাণ্টার প্লেনটা তপনকে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল ঝড়ের বেগে। এক পাক দিয়ে আরও উপরে উঠে উড়ে যেতে লাগলো রণক্ষেত্রের দিকে।

ততক্ষণে আরো পাঁচটা প্লেন আকাশে উঠেছে। স্কোয়াড্রন লীডার নির্দেশ দিলেন ঃ দু'সারিতে তিনখানা করে প্লেন এগিয়ে চলো, ছাম্ব এলাকায় শত্রুঘাঁটির উপর প্লেন থেকে

অগ্নিবৃষ্টি করে একেবারে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে দাও। দেশরক্ষায় জীবনপণ করো! ভারত-বর্ষের মুখ উজ্জ্বল করো—নির্ভীক বন্ধুরা।"

কাঁ কাঁ শব্দে গর্জন করতে করতে আকাশের বুক বিদীর্ণ করে ছখানা হাণ্টার ছুটে চললো প্রলয়নিশান হাতে করে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল যুদ্ধক্ষেত্রে। আকাশ থেকে নীচের যুদ্ধক্ষেত্রের প্রলয়ংকর মূর্তি দেখে যেন আর স্থির থাকা যায় না। উন্নত ধরনের অস্ত্রশস্ত্র আর বিপুলসংখ্যক সৈন্য নিয়ে পাকিস্তান হীনবল ভারতকে আক্রমণ করছে আর ভারতীয় জওয়ানরা প্রাণপণ যুদ্ধ করছে মাতৃভূমির সম্মান রক্ষার জন্য। এমন সময় বেতারে স্কোয়াড্রন লীডারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ঃ "আমাদের সৈন্য-বাহিনীতে খবর দিয়েছি। তোমরা আমাদের সৈন্যদলের মাথায় চক্কর দিতে দিতে হঠাৎ ছোঁ মেরে শত্রুদের আক্রমণ করো। রকেট চালাও! ফায়ার করো। একে একে অথবা পরামর্শ করে।" আদেশ পাবামাত্র তপনের বীরহৃদয় উত্তেজনায় শিহরিত হয়ে উঠলো। সে সঙ্গে সঙ্গে স্কোয়াড্রন লীডারকে জানালো ঃ "প্রথমে আমি আক্রমণ করতে চাই স্যর!"

উত্তর এলো ঃ "ঠিক আছে চৌধুরী!"

সঙ্গে সঙ্গে প্লেনের গতি বাড়িয়ে দিয়ে তপন একটু একটু করে ওপরে উঠে গেল, তারপর শত্রুদের ট্যাঙ্ক লক্ষ্য করে ডাইভ—গোঁত্তা! মাটি ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে, এই তো! এসে গেছে, নেমে গেছে, অনেক নীচে! ট্যাঙ্কগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! বোতাম টিপলো তপন শত্রুদের ট্যাঙ্ক লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে তার প্লেন থেকে বেরিয়ে এলো কতকগুলো আগুনের হাউই আর সেগুলো ট্যাঙ্কের ওপর লেগে বিকট শব্দে ট্যাঙ্কগুলোকে ফাটিয়ে একেবারে চৌচির করে দিলে। চোখের পলকে তপন চোঁ চোঁ করে উঠে গেল ওপরে। ওদিক থেকে স্কোয়াড্রন লীডারের গলা ভেসে এলো ঃ "সাবাস চৌধুরী!"

আবার গোঁত্তা দিল তপনের হাণ্টার প্লেন। ঠিক যেন শিকারী বাজপাখি। এবারে অনেকগুলো সাঁজোয়া গাড়ি জ্বালিয়ে দিলো তপন। একটা ঘাঁটিও একেবারে ধ্বংস হয়ে গেল হাণ্টারের লেলিহান অগ্নিশিখায়। আধ ঘণ্টার মধ্যে ওদের দল পাকিস্তানের প্রচুর ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি ও ঘাঁটি ধ্বংস করে ফিরে এলো বিমানঘাঁটিতে।

১৯৫৪ সালে তপন 'ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স অ্যাকাডেমী' থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেয়। একটু একটু করে উন্নতি করে হয় ফ্লাইং লেফটেনাণ্ট। বিশেষ একটা শিক্ষা নেবার জন্যে মস্কোতে যাবার সব ঠিকঠাক, এমন সময় লেগে গেল যুদ্ধ। আর যুদ্ধের খবর পেয়েই তপনের প্রাণ নবীন উদ্যমে মেতে উঠলো। ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে তপন যে কি ভয়ংকর

ু্ক করেছে তা তার মুখ থেকেই আমরা শুনতে পেয়েছি। কোলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড তার বাবা শ্রীরামচন্দ্র চৌধুরীকে সে লিখেছে—

বাবা,

আমরা ৫ই সেপ্টেম্বর থেকে শত্রুঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাচ্ছি। প্রত্যেকবার আমরা উঁচু আকাশ দিয়ে চলাচল করছি। আমরা পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিয়েছি, একের পর এক শত্রুর সামরিক আস্তানাগুলি ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছি। আমি মাতৃভূমির সম্মান-রক্ষার্থে আমার পবিত্র দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যাচ্ছি। শত্রু আমার বিমানটির গায়ে আঁচড়ও কাটতে পারেনি। মা কালীর আশীর্বাদ ও আপনাদের আশীর্বাদেই এটা সম্ভব হচ্ছে।

৫ই সেপ্টেম্বর থেকে একটুও বিশ্রাম নিইনি। দেশের জন্য জাতির জন্য আমি আমার কর্তব্য করে যাবো। এখন আর সময় নেই, এখন আমাকে আকাশে উঠতে হবে —উদ্দেশ্য শত্রুহনন। সে এক আশ্চর্য রোমাঞ্চকর ব্যাপার।

সত্যিই তপনের কাহিনী আরও রোমাঞ্চকর। এ চিঠিটা যখন তার বাবার কাছে পৌঁছলো তখন তাঁর তপন আর এ পৃথিবীতে নেই।

১৫ই সেপ্টেম্বর তপন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে তার হাণ্টার বিমানের সাহায্যে পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি প্রভৃতি ধ্বংস করছিল তখন দেখতে পেল বহু অস্ত্রশস্ত্র-বই একটা মালগাড়ি যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে আনা হচ্ছে। চোখের সামনে শিকার পেয়ে তপন একেবারে আত্মহারা হয়ে উঠলো। তার হাণ্টার প্লেন নিয়ে উপরে উঠেই সে গোঁত দিয়ে নীচে নামতে লাগলো মালগাড়ি লক্ষ্য করে। গোঁ গোঁ করতে করতে অনেক নীচে নেমে এসে ঝাঁকে ঝাঁকে রকেট আর গোলা-বৃষ্টি করতে লাগলো মালগাড়িটার উপর আর মালগাড়ি ভরতি অস্ত্রশস্ত্রে আগুন ধরে অগ্নিকুণ্ড সৃষ্টি হলো। কিন্তু শত্রুপক্ষের এতটা ক্ষতি বোধহয় বিধাতাও সহ্য করতে পারছিলেন না। একটি বিমান-বিধ্বংসী কামানের গোলা এসে লাগলো তপনের বিমানটায়। বিমানটা কেঁপে উঠলো। তা সত্ত্বেও তপন ওপরে উঠতে লাগলো। উদ্দেশ্য আর একবার গোঁত্তা মারবে। তখনও তপন তার বিপদ্ বুঝতে পারেনি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানটা ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে গেল। আর উপায় নেই। বিকট শব্দ করে তখন বিমানটা দাউ-দাউ করে জ্বলছে। নিপুণ পাইলট তপন চৌধুরী তার হাণ্টার বিমানকে এগিয়ে আনতে লাগল। তখন বিমানটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। বেতারে স্কোয়াড্রন লীডারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল: "প্যারাসুট নিয়ে লাফিয়ে পড়ো চৌধুরী। আর সময় নেই, লাফিয়ে পড়ো!"

কিন্তু সংকল্পে অটল দেশপ্রেমিক তপন উত্তর দিল—"মাফ করবেন স্যর। এখানে নামলে শত্রুদের হাতে বন্দী হতে হবে। আর যুদ্ধ করতে পারবো না। আমি ভারতের মাটিতে গিয়ে নামবো।"

ততক্ষণে বিমানটা অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছে। দুর্বার সৈনিক তপনের মুখের ডানদিকটা ঝলসে যাচ্ছে। কিন্তু তাতেও ভ্রূক্ষেপ নেই। আর বেশী দেরি নেই—আর একটু—আর একটু।

নিপুণ পাইলট তপন অতিরিক্ত দক্ষতার বলে জ্বলন্ত বিমানটার সঙ্গে মাটিতে নামলো, বেরিয়েও এলো। কিন্তু বেরিয়েই পড়ে গেল। সহকর্মীরা ছুটে এসে দেখলো তার দেহে আর প্রাণ নেই। মুখে একটু হাসির রেখা ফেলে রেখে বীর যুবক সারা জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটালো—যে দেশমাতার জন্যে সে মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই দেশমাতার ঋণ পরিশোধ করে বাংলা-মায়ের বীর সন্তান তপন মায়েরই কোলে ফিরে গেল। হে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীর! তুমি চিরকালের চিরবিজয়ীদের শ্রেষ্ঠ!

Lieutenant তপন চৌধুরী আজ শুধু বাংলার নয় সারা ভারতবর্ষের গৌরব।

———

পাথরের সুতো

লোকটি আগুনের মধ্যে একটা ব্যাগ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অথচ তার পোশাক বা ব্যাগটা পুড়ছে না। তার গায়ে কিসের পোশাক? পশুর লোমে পশম হয়, কীটের আবরণ থেকে সিল্ক হয় আর গাছের ফলে তুলো হয়। সবই আমাদের পোশাক তৈরীর কাজে লাগে। সবই আগুনে পোড়ে। কিন্তু এক রকম পাথর আছে যা থেকে চুলের মত সরু সুতো তৈরী হয়। তার নাম অ্যাসবেসটস্। অ্যাসবেসটস্ আগুনে পোড়ে না, বিদ্যুতএর মধ্যে যাতায়াত না করে পারায় সক লাগে না। তাই বহুকাল আগে থেকে আলোর পলতে এই অ্যাসবেসটস্ দিয়ে তৈরী হচ্ছে। তেলটা পোড়ে পলতে অক্ষত থাকে।

উদ্‌ভ্রান্ত টারজান

সব্যসাচী

১১

গলা চেপে ধরে ওয়ার্পারকে গাছের উপর টেনে তুলছে টারজান, আর গুঁড়ির গায়ে ঠুকে ঠেলে দিয়ে কেড়ে নিয়েছে তার কাঁধের ঝুলি। সোনার বাট কখন পড়ে গিয়েছে মাটিতে, তার খোঁজ ওয়ার্পারও রাখে নি, টারজানও না।

ক্ষিপ্রহস্তে ঝুলি খুলে পাথরগুলো হাতের উপরে ঢেলে দিল টারজান। এ কী? বিস্ময় আর নৈরাশ্য সমান ভাবে মেশানো তার প্রশ্নে। আর সে বিস্ময় আর নৈরাশ্যের ভাগী ওয়ার্পার নিজেও। তাই ত! ঝুলিতে ত মণিরত্ন নেই! কতকগুলো সাদা কালো নুড়ি পাথর কোথা থেকে এল এর ভিতরে?

মণিরত্ন যে চুরি হয়ে গিয়েছে কবেই, সেকথা কেমন করে জানবে ওয়ার্পার? সেই থেকে এ-যাবৎ এমন একটু নিরাপদ জায়গায় নিরিবিলি সে বসতে পারে নি, যেখানে থলের মুখ খুলে হীরে মানিকের জৌলুশ নয়ন ভরে নিরীক্ষণ করা যায়। আজ থলে থেকে হীরের বদলে নুড়ি বেরুতে দেখে টারজানের চেয়ে সে অবাক্ হল বেশী।

আর টারজান? অবাক্ সে যতই হোক, রেগে গিয়েছে তার চেয়েও ভয়ানক। কেমন করে কী হল, তা ভেবে দেখার মত ধৈর্য তার এখন নেই, সে প্রথমে পাথর, তার পরে থলে, দূরে ছুড়ে ফেলে দিল মাটিতে। তার পরে ওয়ার্পারকেও ধরে ঠিক তেমনি ভাবেই নিক্ষেপ করল গাছতলায়, একটা মাটির ঢেলার মত।

ভয় ওয়ার্পারের আগেই চরমে উঠেছিল, এবার সে একেবারেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

মাটিতে পড়ে রইল মরার মত, তারই সোনার বাটগুলোর উপরে। টারজান ওদিকে উধাও হয়েছে এক গাছ থেকে অন্য গাছে লাফাতে লাফাতে। ওয়ার্পারের কথা আর তার মাথায় নেই, হারানো হীরে মানিকের কথাও না, কী যে এখন আছে সে-মাথায়, তা নিজেও সে জানে না।

একটা দুর্দান্ত ক্রোধে সে আত্মহারা হয়ে পড়েছে। এমন ভাবে আশার মুখে ছাই আর কখনও পড়ে নি তার। এর শোধ সে তুলবে। কেমন করে তুলবে, তা ভেবে দেখে নি। এখন তার অদম্য বাসনা শুধু, হাতের নাগালে যাকে পাবে, তাকেই দুমড়ে মুচড়ে ছুড়ে মারবে দূর শূন্যে, যেমন একটু আগে ছুড়ে মেরেছে নরাধম সাহেবটাকে।

এইরকম যখন তার মনের অবস্থা, একটা আহ্বান তার কানে এল হঠাৎ। আশ্চর্য এই, আহ্বানটা মহাকপির ভাষায়। লাফাতে লাফাতে গোটা চার পাঁচ মহাবৃক্ষ সে পেরিয়ে এসেছে। এবার যেই নতুন একটা গাছের তেতলায় লাফিয়ে পড়েছে, ডাকটা শোনা গেল সেই গাছেরই দোতলা থেকে।

টারজান নীচে তাকিয়ে দেখল—ডাক দিয়েছে তারই সুপরিচিত চুলুক। দোতলার প্রশস্ত তেডালায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে সে মনোযোগ দিয়েছে সুবৃহৎ সুপক্ক এক কাঁঠাল ভোজনে। কালো মুখ কাঁঠালের রসে হলুদ হয়ে গিয়েছে, ডান হাতের কনুই পর্যন্ত সেই রসে জব-জব। বান্ধবতার উচ্ছ্বাসে বন্ধু টারজানকে সে ডাক দিয়েছে কাঁঠাল ভোজে অংশগ্রহণ করবার জন্য।

তবে রে। কাঁঠাল খাওয়াবি তুই? টারজানকে খাওয়াবি কাঁঠাল? একটা অহেতুক ক্রোধাগ্নি শিখা মেলে লাফিয়ে উঠল টারজানের মাথার খুলি পর্যন্ত। তেতলা থেকে এক লাফে সে নেমে পড়ল দোতলায়। পড়ল একেবারে চুলুকের ঘাড়ের উপর। "এই! এই! করছ কী তুমি?"—বলে জাপটে ধরল চুলুক উদ্‌ভ্রান্ত টারজানকে।

তারপর সে কী যুদ্ধ সেই তেডালার উপর। পুরাণের গজকচ্ছপ লড়াই হার মেনে যায়। ভাঙ্গা কাঁঠাল ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে, ছিটকে পড়ল আরও একটা জিনিস, সে একটা বিবর্ণ থলে। থলেটা গোড়ায় ছিল মুগাম্বির।

চুলুক মহাকপি, মত্ত হস্তীর মত বলবান। সাধারণ অবস্থায় টারজান তাকে সহজে কায়দা করতে পারত না। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় টারজান নেই এই মুহূর্তে। রাগে টগবগ করে ফুটছে তার দেহের রক্ত, আত্মরক্ষার দিকে দৃষ্টি নেই তার। দুই হাত, দুই পা আর বত্রিশটা দাঁত দিয়ে সে যুগপৎ আক্রমণ করেছে চুলুককে। লড়াইয়ের আদবকায়দা নিয়ম-কানুন সব অগ্রাহ্য করে সে শুধু মেরেই যাচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বীকে। সে এলোপাতাড়ি মার চুলুক বেশীক্ষণ সইতে পারল না, সে পালাল।

ফিরে আসা যাক এইবার উরজনের আবাদে। লড়াই এখনও খুচরোভাবে চলছে বই কি। দুটো দল আর মুখোমুখি হুড়োহুড়ি করছে না। দুটো লাইন ধরে মড়ারা এক একটা এক এক ভঙ্গীতে পড়ে আছে মাত্র। তিন চার শো মড়া তো হবেই ডাকাতে আর হাবসীতে মিলিয়ে!

প্রাণ নিয়ে পালিয়েছেও ঢের লোক। ডাকাতেরা পালিয়েছে দলকে ভেঙে, হাবসীরা পালিয়েছে হরদম। মরিয়া লোক দুই দলেই ছিল কিছু। পঞ্চাশের বেশী হবে না তারা মাথা-গুনতিতে। তারাই এখনও ঝোপঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে গুলি চালাচ্ছে একে তাক্ করে। লড়াই-জেতার মতলবে নয়, স্রেফ খুনোখুনির নেশায়।

সে কী যুদ্ধ সেই তেতলার উপর। [পৃষ্ঠা ৮২৪

ওদিকে আসমত শেখ মরেছে। এদিকে মোরাক হয়েছে আহত। মোরাকেরই মাথায় সুবুদ্ধি এল শেষপর্যন্ত। ঝড়তি-পড়তি হাবসী যে-কয়জন তখনও দাঁড়িয়েছিল আশে-পাশে, তাদের ডাকাডাকি করে কাছে আনল। সংখ্যায় তারা মাত্র বত্রিশটি। অল্প-স্বল্প জখম হলেও এদের চলা-ফেরার শক্তি তখনও আছে।

মোরাক বলল—"এখানে আর নয়। যুদ্ধে আমরা জিতেছি। আসমত ঐ পড়ে আছে, ওর মুণ্ডটা কেটে নাও। বাদশাকে দেখাতে হবে। তারপর সবাই মিলে যতগুলি পার, ডাকাত মুণ্ড মাথায় তোলো। তারপর চল জঙ্গলে ঢুকে একটা ছাউনি করি দুই একদিন এক হপ্তার মত। গায়ের ঘাগুলো না শুকোলে হাবসী মুলুক পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার শক্তি আমাদের কারোই হবে না। ঘোড়া যে-কয়টা সঙ্গে ছিল, তারা শোরগোলে ভয় পেয়ে পালিয়েছে!"

হাবসী সৈনিকেরা কেউ কেউ প্রস্তাব করল—"জঙ্গলে ঢুকে ছাউনি করার দরকার কী?

ঐ কুঠি-বাড়িতে দুই চারখানা ঘর এখনও মোটামুটি দাঁড়িয়ে আছে, ওতেই থাকা যাক না—"

"উঁহু",—মোরাক ঝেড়ে অগ্রাহ্য করে দিল সে-প্রস্তাব। আসমতের ডাকাতেরা আশে-পাশে লুকিয়ে আছে কেউ কেউ। রাত্রে তারা আবারও আক্রমণ করতে পারে। লোভ আছে তাদের। ঐ সোনার উপর লোভ। তা ছাড়া কাল সকালে রোদ ওঠার সঙ্গে এই শত শত মড়া থেকে পচা গন্ধ বেরুতে শুরু হবে। পালাতে তখন হবেই। তার চেয়ে এখন পালানোই সুবিধা।"

অতঃপর জখমী দেহ নিয়েই হাবসীরা সোনার বাট মাথায় তুলতে লাগল। লোক তারা বত্রিশ জন। অথচ বাট যা রয়েছে, তা পুরো পঞ্চাশ জনের বোঝা। তবু মরি বাঁচি করে সব বাটই ঐ বত্রিশ জনে মাথায় তুলল। মেরুদণ্ড ভেঙে যায় যদি, সেও কি আচ্ছা, আসমতের ডাকাতগুলোর জন্য একখানা বাটও তারা রেখে যাবে না।

* * * *

এদিকে ওয়ার্পার মরে নি কিন্তু। মাটির ঢেলার মত তাকে মাটিতে ছুড়ে মারলেন টারজান, ঢেলার মতই নিঃসাড়ে সে পড়ে রইল বহুক্ষণ অজ্ঞান হয়ে। অবশেষে চৈতন্য যখন ফিরল, জ্যান্ত বলে সে বিশ্বাসই করতে পারে না নিজেকে। বারবার করে মাথা টিপে টিপে দেখে, হাত-পা ভেঙ্গেছে কিনা—পরখ করে সাবধানে।

শেষ পর্যন্ত যখন বুঝতে পারল যে সত্যিই সে বেঁচে রয়েছে, হাত-পা অটুটও আছে বরাতগুণে, তখন সে উঠে বসল আস্তে আস্তে। সামনেই কালো-পাথর ছড়ানো রয়েছে অনেকগুলো। বুকটা ছাঁৎ করে উঠল তার। তাই ত! সর্বনাশই ত হয়ে গিয়েছে! অত সাধের হীরে-মানিকগুলো! গেল কোথায়? চোরের ধন বাটপাড়ে নিলে? কে নিলে? কখন নিলে? কেমন করে নিলে? ওয়ার্পার কি মরে ছিল তখন? হায় হায় হায়, ওয়ার্পার যে রাজ্য কিনবে ও দিয়ে, ঠিক করে বসে আছে! সব গেল! আজ আবার যে ফকির, সেই ফকির সে?

হঠাৎ মনে পড়ল সোনার বাটের কথা। আবাদের গর্ত সে নিজেই দেখিয়ে দিয়েছিল মোরাককে। বোকা ওয়ার্পার! বেকুফ ওয়ার্পার! গাধা ওয়ার্পার! দুই হাত দিয়ে দুই গাল চড়াতে লাগল ওয়ার্পার। নিজের পায়ে নিজে সে কুড়োল মেরেছে। এতক্ষণ বাট বেহাত। মোরাকই নিয়ে থাকুক আর আসমত শেখই নিয়ে থাকুক, ওয়ার্পারের পক্ষে সমান কথা! ঢুঁ-ঢুঁ তার কপালে।

হঠাৎ সে চমকে উঠল, পায়ের তলায় কী ঠেকছে ও? তাইত! দুখানা বাট সে কাঁধে করে এনেছিল আবাদ থেকে পালাবার সময়, সে-দুটো এই যে পড়ে আছে পাশেই!

জয় যীশু! একেবারে নিঃস্ব তাহলে নয় ওয়ার্পার। দুখানা সোনার বাট কম নয়। এ দিয়ে রাজ্য কেনা না যাক, ভাল একটা ব্যবসা ফেঁদে বসা যেতে পারে যে-কোন সভ্যদেশে। না খেয়ে মরার আশঙ্কা বোধ হয় নেই তার।

যে চোখে ঘন ঘোর অন্ধকার দেখছিল ওয়ার্পার, সেই চোখের উপরেই যেন একটু একটু করে আলো ফুটতে লাগল আবার। লেডী জেন-এর থলেটা কুড়িয়ে নিয়ে তাই দিয়ে সযত্নে মুছে ফেলল বাটের গা থেকে ধুলোবালি। তারপর আবার দুই কাঁধে দুই বাট নিয়ে ওয়ার্পার জঙ্গলের পথে পা বাড়াল।

যায় নি খুব বেশী দূর। আবারও একটা প্রকাণ্ড গাছের তলা দিয়ে তার পথ। হঠাৎ মাথার উপর একটা আওয়াজ শুনে গায়ে তার কাঁটা দিয়ে উঠল। এ আওয়াজ তার অপরিচিত নয়। বেশ মনে পড়ছে—ওপারের সূর্যদেবতার মন্দির থেকে তাকে কাঁধে করে নিয়ে টারজান পালায় যখন, পাঁচিলের উপর থেকে বহু কণ্ঠের আওয়াজ এসেছিল এই ভাষায়। আর ঐ টারজান? লোকটা জাদু জানে নিশ্চয়। ঐ ভাষাতেই চেঁচিয়ে বলিয়ে কী সব বলেছিল যেন। আর তাই শুনে—

হ্যাঁ, এ ভাষা নিয়্যস্ মহাকপিদের ভাষা। ভয়ে ভয়ে ওয়ার্পার উপরপানে তাকাল। একটা তুলকালাম কাণ্ড চলেছে ওখানে। ডালের উপর দাঁড়িয়ে লড়াই করছে দুটো জন্তু। না, ভুল হল। ঐ লোমশ জন্তুটা জন্তুই অবশ্য, মহাকপি বলেই মনে হয়। কিন্তু অন্যটা? না তার ওয়ার্পারের চেয়ে মসৃণ, রংটা তামাটে হলেও গোড়ায় যে সাদাই ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। ও মানে ঐ নির্লোম প্রাণীটা মানুষ—মানে টারজান নয় ত? সিংহচর্মই যেন ওর পরনে? ওই যীশু! এ আবার কী বিপদে ফেললে? আবার টারজানের সামনে?

এই একটু আগেই প্রাণটা যেতে বসেছিল টারজানের হাতে। এখনও সে হাতের নিষ্ঠুর পেষণে গলাটা টাটিয়ে আছে। সেবার কী মনে করে জানে মেরে দেয় নি, কে জানে। এবার আর নিশ্চয় ছাড়বে না।

ঝুপ্! কাঁঠাল পড়ল একটা ওয়ার্পারের মাথায়। পরিস্থিতি এত সংকটসংকুল না হলে টারজানের এই কাঁঠাল উপহারকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারত ওয়ার্পার, কারণ ক্ষুধা তার বিলক্ষণ পেয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে গাছতলায় বসে কাঁঠাল খাওয়ার কথা ভাবতেই সে করতে পারে না। লেডী জেন-এর থলেটা দিয়ে মাথা মুখ থেকে যথাসম্ভব কাঁঠালের রস সে মুছে ফেলল, তারপর পা চালিয়ে দিল এই অপয়া গাছটা পেরিয়ে যাবার জন্য।

ঝনাৎ ঝন্! আবার কী পড়ল হে? এটা আবার কী পড়ল? আর একটা কাঁঠাল

নিশ্চয় নয়। কাঁঠাল পড়ে ঝুপ করে, বা ধপ করে, বা পড়ে যদি এলিয়ে যায়, শব্দটা ভ্যাঁস বা ফ্যাঁস জাতীয়ও হতে পারে। কিন্তু ঝনাৎ ঝন? না বাবা, এবার এটা কাঁঠাল নয়, আম-জাম আনারসও নয়, একথা ওয়ার্পার হলফ নিয়ে বলতে পারে।

তবে কী এটা? মোহরের থলে-টলে নয় ত? আটক কী? যে রাজ্যে সোনার বাট পথে ঘাটে ছড়িয়ে থাকে, মণিমুক্তোর থলে নিয়ে সাদা মানুষে-কালো মানুষে-বন মানুষে লোফালুফি করে, সেরাজ্যে এক থলে মোহর গাছ থেকে পড়বে দরিদ্র ওয়ার্পারের দারিদ্র্য ঘোচাবার জন্য, এ আর বিচিত্র কী?

উপরের লড়াই চলছে এখনও। চলুক!

ওয়ার্পার নিঃশব্দে ডিঙ্গি মেরে মেরে ফিরে এল। একটা বদ-রং থলে পড়ে আছে বটে। মুখটাও খুলে গিয়েছে তার পড়ার সময়। থলে থেকে বেরিয়ে পড়েছে এক রাশ—

ওয়ার্পার চোখে অন্ধকার দেখল হঠাৎ। মাথাটা ঘুরে উঠেছে। এ সেই সবহারানো মানিক। গোড়ায় ছিল টারজানের, তারপর ছিল ওয়ার্পারের—

তারপর, এই খানিকটা আগে, টারজানের হাতে যখন ধরা পড়ল ওয়ার্পার, তখনই প্রথম আবিষ্কার করল সে, হ্যাঁ, আবিষ্কার করল যে থলে থেকে মণিরত্ন বার করে নিয়ে— তবে? তবে আবার সে সব কোথা থেকে এল এখন? চোখে ভুল দেখছে না ত ওয়ার্পার? মাথা খারাপ হয়ে যায়নি ত তার?

উপরের লড়াই থেমে গিয়েছে ততক্ষণ। চুলুক পালিয়েছে গাছ থেকে গাছে লাফাতে লাফাতে। টারজান তার পিছু নেয়নি বটে, কিন্তু লোহার মত কঠিন বুকে দড়াম দড়াম করে চাপড় মারছে দুই হাতের, তা থেকে আওয়াজ উঠছে যেন দমদম জয়ঢাকের। গর্জাতে গর্জাতে সে ধীরে সুস্থে তেতলায় উঠল দোতলা থেকে, তেতলা থেকে আবার উঠল চার-তলার ডালে, তারপর আর তার গর্জানিও শোনা গেল না, গাছতলায় বসে ওয়ার্পার আর দেখতেও পেল না তাকে।

ওয়ার্পার ঠায় বসে আছে হীরের থলি সামনে নিয়ে। একটু একটু করে মাথা ঠাণ্ডা হচ্ছে তার। বিচার বুদ্ধি ফিরে আসছে ধীরে ধীরে। সে ভাবছে।

দুনিয়ায় অসম্ভব বলে যে কিছু আছে, আজকের এ ঘটনার পরে তা আর বিশ্বাস করতে পারবে না ওয়ার্পার। যা হারিয়েছিল, তা আবার আপনা থেকে ফিরে এসেছে। এখন এ জিনিস ওয়ার্পারের ছাড়া আর কারও নয়। আগে যার ছিল, সেই ত ফেলে দিয়ে গেল তার সমুখে! সুতরাং এটা এখন সে নিতে পারে নির্ভয়ে। ভাগ্য অনুকূল, কে তার প্রাপ্তিযোগে বাগড়া দেয়?

বসে বসে সে আবার থলেতে ভরতে লাগল মণিগুলো। বদ-রং পুরোনো থলেতে

নয়। লেডী জেন-এর নিজ হাতে বোনা থলে, হীরে মানিকের মানানসই আধার, তাতেই ছিল এসব, তাতেই আবার তুলল।

* * *

হতাবশেষ হাবসীদের মাথায় মাথায় সোনার বাট চাপিয়ে মোরাক যখন লড়াইয়ের মাঠ ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকল, আসমত শেখের অনুচরেরাও আর সেখানে অপেক্ষা করার কোন দরকার দেখল না। সোনা সব পাচার হয়ে গেল, ঘাসবনে লুকিয়ে লুকিয়ে সেটাই তা দেখেছে তারা। সংখ্যায় হাবসীরা বেশী, ওদের আক্রমণ করতে যাওয়া বোকামি শুধু। দস্যুরাও কাজে কাজেই কঙ্গোসীমান্তের দিকে রওনা হয়ে পড়ল।

ভারী বিমর্ষ দস্যুরা। দলপতি আসমত মারা পড়েছে, দলের তিনশো মরদ মরতে মরতে এখন জনা-কুড়িতে ঠেকেছে। আরও অবশ্য ছাউনিতে জনা-কুড়ি-পঁচিশ আছে, লেডী জেন-এর পাহারায়। কিন্তু মোট সংখ্যা পঞ্চাশেও পৌঁছোচ্চে না যখন, দল ত ভেঙ্গেই গেল, বলা চলে। ঐ কয়টা লোক কি আর বড়-রকম কোন কাজে হাত দিতে পারে ?

বেচারীরা! তারা ত জানে না যে আসমত ছাউনি থেকে রওনা হয়ে আসবার পরে লেডী জেনও পালিয়ে গিয়েছে, কুঁড়ে ঘরের মাটির মেঝেতে সিঁধ কেটে!

যাক, মরুক পাজী দস্যুগুলো! ওদের জন্য মন কাঁদবে না কঙ্গোর বা ওয়াজিরি-স্থানের একটা প্রাণীরও। চিরদিন অন্যকে জ্বালিয়েছে, এবার নিজেরা জ্বলুক খানিকটা।

মোরাকের হাবসীরা গিয়েছে, আসমতের দস্যুরাও বিদায় হলো। টারজানের পরিত্যক্ত আবাদ শুধু মৃতদেহে ভর্তি। বেলা এক প্রহর থাকতেই আকাশ থেকে শকুনির ঝাঁক, আর অরণ্য থেকে হায়েনার পাল এসে ভূরিভোজে বসে গেল সারি বেঁধে। কিন্তু শান্তিতে বসে ভোজ খাওয়া বরাতে নেই তাদের, এই ভয়াবহ দৃশ্যের মাঝ-খানে আবারও জীবিত মানুষের আবির্ভাব ঘটল সন্ধ্যার আগেই।

একজন দুজন নয়, বৃহৎ একটা দল। অন্ততঃ শ-দুই ওয়াজিরি। বাস্থলি ফিরে এসেছে। তার নিজস্ব লোকেরা ত আছেই সঙ্গে, ওয়াজিরিস্তানের নানা গ্রাম থেকে নতুন নতুন লোকও সে সংগ্রহ করে এনেছে। আরও বিস্তর লোক পিছনে আসছে। দুই এক হপ্তা এখন আসতেই থাকবে ওরা। বাস্থলি মতলব করেছে, আবাদের ঘরগুলি সংস্কার মেরামত করে এখানেই সে এইসব লোককে বন্দুক চালনায় শিক্ষিত করে তুলবে তারপর এইখান থেকে চলে যাবে কঙ্গোর জঙ্গলে, আসমতের ছাউনি থেকে লেডী জেনকে উদ্ধার করে আনবার জন্য।

এসেই যা দেখল, তাতে সে হতবাক্। আগের বারও আবাদে এসে সে এক বীভৎস দৃশ্য দেখেছিল। কিন্তু এবারের তুলনায় সেটা ছিল অনেক ছোট ব্যাপার।

উপর থেকে উলটে পড়ে গেল সেই লোকটা।
[পৃষ্ঠা ৮৩১

এবার যে তার সমুখে একটা রক্তপিছল যুদ্ধক্ষেত্রই পড়ে আছে! কারা এরা? এই দুটো দল, যারা পরস্পরে হানাহানি করে এমন বিপুল সংখ্যায় যমদ্বারের অতিথি হলো?

প্রথম চমকটা কেটে যাবার পরেই কিন্তু বাসুলি ছুটল সেই কাঁটাঝোপের দিকে, যার ভিতরে মাটির তলায়, সে পুঁতে রেখে গিয়েছিল ওপার থেকে বয়ে-আনা চারশো সোনার বাট। সর্বনাশ! সর্বনাশ! একখানি বাটও সেখানে নেই। সব গিয়েছে।

নিয়ে গিয়েছে সব। কিন্তু যাবে কোথায়? বেশীক্ষণ আগে তারা যায়নি। যুদ্ধটা শেষ হয়েছে বোধ হয় ঘণ্টা তিনেক আগে, কতদূর আর যাবে ওরা? বিশেষ সবাই নিশ্চয় শ্রান্ত রয়েছে লড়াইয়ের ধকলে। সোনার বোঝা মাথায় নিয়ে এর মধ্যে বেশী পথ তারা নিশ্চয় পেরুতে পারে নি।

কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে অরণ্যের দিকে ছুটল বাসুলির লোকেরা। বত্রিশটা মানুষ অল্পক্ষণ আগে যে পথ দিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছে, তা খুঁজে পাওয়া এসব বনচরের পক্ষে শক্ত কাজ নয়। এক ঘণ্টার ভিতরেই মোরাকেব সদ্য গড়ে তোলা ছাউনি তারা বেষ্টন করে ফেলল।

মোরাক লড়াই করল বই কি! কিন্তু দুশোর সঙ্গে বত্রিশের লড়াই কতক্ষণ চলতে পারে? কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় সবাই মারা পড়ল। পালালও কয়েক জন! তাদের পিছু ধাওয়া করল একদল ওয়াজিরি। বাকী সবাই রইল সোনার পাহারায়।

পলাতকদের পিছনে যারা ছুটেছিল, তারা ছড়িয়ে পড়েছে বনের ভিতর। দিনের

আলো নিবে আসছে। আঁধার ঘনিয়ে আধার আগে যাদের ধরা না যাবে, তাদের আর ধরার আশাই নেই! তন্নতন্ন করে তারা খুঁজছে ঝোপ-ঝাড়। চোখানজরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে বড় বড় গাছের শাখাপ্রশাখা।

ঝোপঝাড়ে কয়েকজন ধরাও পড়ল বই কি!

এদিকে উপরপানে তাকিয়ে এক ওয়াজিরি দেখল—একটা লোক বৃহৎ এক বনস্পতির তেতলার তেডালায় বসে আছে, গুঁড়িতে হেলান দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সে গুলি চালাল। সঙ্গে সঙ্গে উপর থেকে উলটে পড়ে গেল সেই লোকটা।

পড়ল একটা ঝোপের উপর, নইলে হাড় গুঁড়িয়ে যেত তার সারা দেহের। ধরাধরি করে ঝোপ থেকে তাকে বার করা হল। মাথায় গুলি লেগেছে। তবে মরে যায়নি এখনও, শ্বাস বইছে।

গা খালি লোকটার। কিন্তু পরনে? এ কী? পরনে সিংহচর্ম না? এক কুড়ি ওয়াজিরি সমস্বরে হাহাকার করল। তারাই গুলি করে মেরেছে তাদের বোয়ানাকে।

হ্যাঁ, মাথায় গুলি লেগে এইমাত্র যে তেতলার ডাল থেকে পড়ে গেল, সে টারজানই বটে। চুলুকের সঙ্গে যুদ্ধে শ্রান্ত হয়ে বেচারী ঘুমিয়ে পড়েছিল একটু।

(ক্রমশঃ)

শুকনো আবহাওয়া

পাখীরা মাটির কাছ দিয়ে ওড়ে না। কিন্তু আবহাওয়া সাঁতসেঁতে হলে পাখীদের মাটির কাছাকাছি উড়তে দেখা যায়। বিশেষজ্ঞরা অনুসন্ধান করে দেখেছেন সাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় কীটপতঙ্গের পাখনা জলে ভিজে ভারী হয়ে ওঠার ফলে তারা বেশী উঁচুতে উঠতে পারে না। তাই তাদের খাবারের জন্যে পাখীরা নীচে এসে উড়তে থাকে।

রাজকুমার মৈত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]

৯

পরের দিন সকালে দৈনিক কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে ছাপা হল গত রাত্রের ঘটনা।

একদল সশস্ত্র ডাকাত গত রাত্রে শ্রীরমাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি চড়াও হয়। ডাকাতদলের গুলিতে শ্রীরমাশঙ্করের ভাইপো শ্রীমণিশঙ্কর আহত হয়েছে এবং সমরু নামক ভৃত্য নিহত হয়েছে। শ্রীমণিশঙ্করকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এই ঘটনায় পুলিস কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। অথচ গলির মুখে গত রাত্রে রীতিমত বন্দুকের লড়াই হয়ে গেছে। একটা কালো অ্যামবাসাডর অকুস্থলে পাওয়া গেছে। গাড়ির ড্রাইভারের মগজ বুলেটের আঘাতে গুঁড়িয়ে গেছে। ড্রাইভারকে এদেশী লোক বলে মনে হয় না। ড্রাইভারের পকেটে হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের ঠিকানা পাওয়া গেছে। পুলিসের সন্দেহ একদল ডাকাত উক্ত গাড়িতে ছিল। কার সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হল, কার গুলিতে ড্রাইভার নিহত হয় পুলিস এখনও জানতে পারেনি।

পুলিস রমাশঙ্করবাবুর খোঁজ করছেন। তিনি নিখোঁজ। গত রাত্রে তিনি বেলেঘাটায় ছিলেন বলেও মনে হচ্ছে না। শ্রীমণিশঙ্করবাবু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কিছু বোঝাও যাবে না। জোর পুলিসের তদন্ত চলছে।.....ইত্যাদি—

গত রাত্রে সুরেশকে প্রফেসর সেন টেলিফোনে সবই জানিয়ে বলেছিলেন,—আপাততঃ আমাদের করার কিছুই নেই। রমাশঙ্করবাবু খুবই মুষড়ে পড়েছেন। আমি তাঁকে নিয়ে

ব্যস্ত আছি। তুমি এক কাজ কর ভোর ছটার সময় বেলেঘাটায় রমাশঙ্করবাবুর বাড়ির কাছে লেটার বক্সের পাশে গিয়ে অপেক্ষা কর। ৬-৩০ মিনিটে পোস্ট অফিসের পিওন আসবে লেটার বক্স খুলে চিঠি নেবার জন্যে। তুমি পিওনকে বলবে গতকাল রাত্রে গণ্ডগোলের সময় তুমি তোমার ডায়েরী আর একটা কাগজ ভয় পেয়ে লেটার বক্স-এ পোস্ট করে পালিয়েছিলে। মোট কথা, যেমন করে পার ঐ দুটো জিনিস নিয়ে সোজা আমার বাড়িতে চলে আসবে।

সেই মত সুরেশ প্রথমে বেলেঘাটার পুলিস স্টেশনে যায়। সেখানে তার এক বন্ধু কাজ করে। তাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল বেলেঘাটায় যথাস্থানে। ঠিক ৬-৩০ মিঃ পিওন এল পোস্ট বক্স ক্লিয়ার করতে।

সঙ্গে পুলিস ছিল বলে পিওন আপত্তি করেনি। ডায়েরী আর ম্যাপ আঁকা কাগজটা সুরেশকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

সুরেশ সোজা ফিরে আসে যোধপুর পার্কে, প্রফেসর ত্রিদিব সেনের বাড়িতে। ডায়েরী আর ম্যাপটা ফিরে পেয়ে প্রফেসর সেন খুব খুশী হলেন।

সুরেশ বললে,—স্যার পুলিস রমাশঙ্করবাবুর স্টেটমেণ্ট নেবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। এই সময় ওঁনার কি চুপচাপ বসে থাকা উচিত।

প্রফেসর সেন বললেন,—উচিত নয় জানি। আজই রমাশঙ্করবাবু পুলিস কমিশনারের সঙ্গে লালবাজারে গিয়ে দেখা করবেন। ওঁর সঙ্গে আমিও থাকব। আমাদের গাড়ি তুমি আর ভ্রমর সিং ফলো করবে। আমি সংগ্রাম সিংকে বিশ্বাস করি না। সে এখন মরিয়া। যদি কোন গাড়িকে বেপরোয়াভাবে আমাদের গাড়িকে চার্জ করতে দেখ তখনই গুলি চালাবে। এতটুকু হেজিটেট্ করো না।

—রাইট স্যার।

—আমরা রওনা হব বেলা দশটায়।

ডায়েরী আর ম্যাপটা রমাশঙ্করবাবুকে ফেরত দিতে গেলেন প্রফেসর সেন। রমাশঙ্কর-বাবু নিলেন না। প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললেন,—না না ওসব আমার আর দরকার নেই মশাই। ম্যাপ আমি শেষ করে দিয়েছি। আর আমার কিছু করার নেই। এবার ওটা আপনার কাছেই রাখুন।

প্রফেসর সেন গম্ভীর হয়ে বললেন —তার মানে আপনি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন।

—না প্রফেসর ভয়ে নয়, ঘৃণায়। ঐ দুটো জিনিসের জন্যে আমি সমরুকে হারালুম, হয়তো মণিকেও হারাতে হবে। প্রফেসর, দুনিয়ায় ঐ মণি ছাড়া আমার আর কে আছে বলতে পারেন। রত্ন সিংহাসন উদ্ধার করে আমার লাভ। ওটা জাতীয় সম্পত্তি। সুতরাং

—অপরাধ। অপরাধ আপনি রত্ন সিংহাসনের হদিস জানেন।

শিলালিপির সাংকেতিক ভাষা আর যা যা আমি পেয়েছি সবই আপনাকে বুঝিয়ে দেব। আপনি যদি পারেন উদ্ধার করুন। রমাশঙ্করবাবু নিস্তেজ কণ্ঠে কথাগুলো বলে সোফায় গা এলিয়ে দিলেন।

প্রফেসর সেন বললেন,—রামাশঙ্করবাবু আপনি হাল ছেড়ে দিলেও সংগ্রাম সিং আপনাকে ছেড়ে দেবে না। যেখানেই থাকুন, আপনাকে খুঁজে বের করে চরম প্রতিশোধ সে নেবেই।

—প্রতিশোধ কেন নেবে। আমার অপরাধ—

—অপরাধ। অপরাধ আপনি রত্ন সিংহাসনের হদিস জানেন। সংগ্রাম সিং রত্ন সিংহাসন পেলেও আপনাকে হত্যা করবে না পেলেও করবে। রমাশঙ্করবাবু কাপুরুষের মত মার খেয়ে মরার চেয়ে যুদ্ধ করে মরা অনেক ভাল। তাছাড়া আপনি শিক্ষিত। জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা, আপনার মত লোকের পবিত্র কর্তব্য হওয়া উচিত।

রমাশঙ্করবাবু প্রতিবাদ করতে পারলেন না। মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন।

* * * *

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রফেসর সেন রমাশঙ্করবাবুকে নিয়ে লালবাজারে গিয়ে হাজির হলেন। ওদের গাড়িটা থানার গেটের মধ্যে অদৃশ্য হতে সুরেশ তার গাড়িটা ফুটপাত ঘেঁষে দাঁড় করাল।

সেদিন ছিল রবিবার। পথে মোটে ভিড় ছিল না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চারপাশে নজর রাখতে লাগল।

লালবাজার থানার বিপরীত ফুটপাতের ওপর একজন ফলওয়ালা আগে থেকেই ফল বিক্রি করছিল। প্রফেসর সেনের গাড়িটা দেখেই লোকটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। তারপরই সুরেশের গাড়িটা থানার পাশে ফুটপাতের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে লোকটা সন্দেহজনকভাবে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল।

সুরেশের সঙ্গে চোখাচোখি হতে লোকটা থতমত খেয়ে চোখ ঘুরিয়ে আড়চোখে তাকাতে থাকে। সুরেশের হঠাৎ মনে হল ফলওয়ালাকে সে যেন কোথায় দেখেছে! কিন্তু কোথায়, কিছুতেই মনে করতে পারছিল না।

গাড়ির ভিতরে বসেছিল ভ্রমর সিং। সুরেশ ফলওয়ালার ওপর নজর রেখে বিড়বিড় করে ভ্রমর সিংকে বললে—ভ্রমর সিং ঐ ফলওয়ালার মুখটা ভাল করে দেখ ত। ওকে যেন কোথায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

ভ্রমর সিং তাকাল। ওর ভ্রু কুঁচকে উঠল। ভাল করে দেখে বললে,—হ্যাঁ আব ঠিক চিনিয়েছে। ও তো সংগ্রাম সিংকা আদমি।

সুরেশ চমকে ওঠে,—সে কি! আরে তাই তো এইবার মনে পড়েছে ঐ লোকটা রমাশঙ্করবাবুকে পাহারা দিত। আমরা তো ওকে দেবগিরিতে বেঁধে রেখে এসেছিলাম। বেটাচ্ছেলে এখানে কি করছে?

—পুছবো।

—না। দেখাই যাক না লোকটা কি করে।

—কি আবার করবে। নজর রাখনে কে লিয়ে খাড়া হ্যায়। সুরেশবাবু হামি লোকটার পিছু নেব। ও জায়গা কাঁহা—

—ভ্রমর সিং এমন কিছু করো না যাতে তোমার মনিবের কোন ক্ষতি হয়।

—কি ক্ষতি হোবে। দরকার হোলে ওর লাশ নাবিয়ে দেব।

—থাক তোমাকে আর বাহাদুরি করতে হবে না। ওদের দৌড়টা দেখা যাক।

একজন ক্রেতা ফলওয়ালার কাছে ফল কেনার জন্যে এল। সেই সুযোগে সুরেশ ভ্রমর সিংকে বলল,—ভ্রমর সিং তুমি যদি লোকটার পিছু নিতে চাও তবে এই সুযোগে গাড়ি থেকে নেমে পড়। লোকটা তোমাকে দেখতে পায়নি।

সুরেশ কথা শেষ করার আগেই ভ্রমর সিং গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। সুরেশ লোকটাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে গাড়ি নিয়ে সোজা লালবাজার থানার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

লোকটা আড় চোখে তাকাল। সুরেশের গাড়িটা দেখতে না পেয়ে লোকটা একটু আশ্চর্য হল যেন। এদিক ওদিক তাকিয়েও যখন দেখতে পেল না তখন ফলের ঝুড়ি মাথায় করে থানার গেটের সোজাসুজি দাঁড়িয়ে ভেতরটা লক্ষ্য করতে লাগল।

ভ্রমর সিং এক ফাঁকে ট্রাম লাইন অতিক্রম করে লোকটার অলক্ষ্যে তার ওপর নজর রাখতে লাগল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে প্রফেসর সেনের গাড়িটা থানা থেকে বেরিয়ে এল। হঠাৎ ফলওয়ালা লোকটা ফলের ঝুড়ি ফেলে ছুটে এল। তার ফতুয়ার পকেটে ছিল গ্রেনেড। লোকটা প্রফেসর সেনের গাড়ি লক্ষ্য করে যেই গ্রেনেড ছুড়তে যাবে অমনি ভ্রমর সিং বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে এসে জোড়াপায়ে লোকটাকে এমন একটা লাথি মারল যে লোকটা লাট্টুর মত পাক খেয়ে ট্রাম লাইনের ওপর আছড়ে পড়ল সেই সঙ্গে গ্রেনেডটা তার হাতের মধ্যেই সশব্দে বিদীর্ণ হল।

থানার গেটে পাহারারত কনেস্টবলটি প্রথম থেকেই সমস্ত ঘটনা লক্ষ্য করেছিল। ভ্রমর সিংয়ের জন্যে প্রফেসর সেন এবং রমাশঙ্করবাবু আর একবার প্রাণে বেঁচে গেলেন।

কনেস্টবলের চিৎকারে থানার আরও কয়েকজন কনেস্টবল এবং দু'চার জন পথচারী ছুটে এসে ফলওয়ালাকে ঘিরে ধরল। সে তখন মরণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে।

ভ্রমর সিংয়ের কিছুই হয়নি। হেলতে দুলতে এসে আহত লোকটার ফতুয়া ধরে টেনে তুলে চড়া সুরে বললে,—বোল্ কোন আদমি তুমকো ভেজা থা। নেহি তো তেরা জীব খিঁচকে নিকাল লেগা। বোল—

লোকটার কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। গ্রেনেডের আঘাতে তার ডান হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। মুখ, পেট, বুক কিছুই অক্ষত ছিল না।

দেখতে দেখতে ভিড় জমে গেল। প্রফেসর সেন এক ফাঁকে এসে লোকটার পকেট সার্চ করে পেলেন একটা নোট বই। সকলের অলক্ষ্যে তিনি নোট বইটা পকেটস্থ করে রায় দিলেন,—হি ইজ ডেড।

লালবাজার থানাতেও হুলুস্থুল পড়ে গিয়েছিল। এমন কি পুলিস কমিশনারও ছুটে এসেছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী কনেস্টবল ও পথচারীদের মুখ থেকে সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি প্রফেসর সেনকে বারবার সাবধান করে দিতে লাগলেন। বললেন,—এর পর আমি আপনাদের একা ঘোরাফেরা করতে বলব না প্রফেসর। আমার মনে হয় আপনার সঙ্গে দু'জন প্লেন ড্রেসে পুলিস রাখা উচিত।

প্রফেসর সেন মৃদু হেসে বললেন,—আমি নিজের শক্তির ওপর যথেষ্ট আস্থা রাখি কমিশনার। তাছাড়া আমার সঙ্গে ভ্রমর সিং সব সময়েই থাকে। ও একাই এক ব্যাটালিয়ান পুলিসের কাজ করতে পারে।

প্রফেসর সেন রমাশঙ্করবাবুকে নিয়ে ফিরে এলেন তাঁর বাড়িতে। তাঁর গাড়িকে অনুসরণ করে এল সুরেশ আর ভ্রমর সিং।

রমাশঙ্করবাবু ভীতু প্রকৃতির মানুষ হলেও উক্ত ঘটনার পর প্রফেসর সেন এবং তাঁর দলবলের ওপর যথেষ্ট আস্থা ফিরে এসেছিল। তিনি বললেন,—ভেবে দেখলাম আপনার কথাই ঠিক। মার খেয়ে কাপুরুষের মত মরার চেয়ে যুদ্ধ করে মরা অনেক ভাল। মণির অবস্থায় আমি মুষড়ে পড়েছিলাম। আমাকে ক্ষমা করবেন প্রফেসর সেন। সংগ্রাম সিংয়ের সঙ্গে কোন রকম কম্‌প্রোমাইজ করতে চাই না। এবার থেকে আত্মরক্ষা না করে আমি ওদের আক্রমণ করতে চাই। পুলিস কমিশনার যা বললেন তাতে আমরা পুলিসের সাহায্য যখন তখন পাব।

ভ্রমর সিং জোড়াপায়ে লোকটাকে এমন লাথি মারল··· [পৃষ্ঠা ৮৩৬

প্রফেসর সেন মৃদু হেসে বললেন,—রাইট। তবে সবার আগে সংগ্রাম সিংয়ের কলকাতার ঠিকানা আমার চাই।

বলতে বলতে তিনি ফলওয়ালা লোকটার পকেট থেকে তুলে নেওয়া নোট বইটা বের করে পাতা ওলটাতে লাগলেন।

রমাশঙ্করবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—ওটা কি ?

—নোট বই। ফলওয়ালার ফতুয়ার পকেটে ছিল। দাঁড়ান দেখি এর মধ্যে কোন হদিস পাওয়া যায় কিনা।

নোট বইতে ফলের হিসেব প্রভৃতি লেখা রয়েছে। কোন্ তারিখে কোথা থেকে ফল কেনা হয়েছে। সারা দিনে কত লাভ হয়েছে। মহাজনকে কত টাকা দিতে হবে, তার হিসেব বেশ পরিষ্কার উর্দুতে লেখা।

নোট বইটার একেবারে শেষের পাতায় মহাজনের নামের আদ্যক্ষর এবং ঠিকানা লেখা রয়েছে। প্রফেসর সেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন। চিন্তা করার সময় এক নাগাড়ে তিনি পাইপ টানতে থাকেন। সুরেশ এবং ভ্রমর সিং সেটা জানে তাই সেই সময় তাঁকে কোন প্রশ্ন করে না।

প্রায় আধঘণ্টা পরে প্রফেসর সেন হঠাৎ পায়চারি করতে করতে বললেন,—ওদের মতলবটা আমাদের পুরোপুরি জানা দরকার। ওরা আপনাকে খুন করতে চায়। না বেমালুম গুম করে আবার দেবগিরিতে নিয়ে যেতে চায়। কোন্‌টা। তাছাড়া আমার সম্বন্ধে ওরা কতদূর জেনেছে। আমরাই যে আপনাকে দেবগিরি থেকে উদ্ধার করে এনেছি সেটা সংগ্রাম সিং জানে কিনা। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর আজ কালের মধ্যেই আমার চাই।

রমাশঙ্করবাবু বললেন,—কে আপনাকে এসব প্রশ্নের উত্তর দেবে?

—কেউ দেবে না। আমাদেরই জেনে নিতে হবে।

—কেমন করে?

—চোরের ওপর বাটপাড়ি করে।

—অর্থাৎ—

—অর্থাৎ আজ রাত্রে মৃত ফলওয়ালার মহাজনের বাড়িতে ছদ্মবেশে চড়াও হতে হবে। নোট বইতে মহাজনের ঠিকানা আছে কিন্তু পুরো নামটা লেখা নেই। শুধু নামের আদ্যক্ষর পেয়েছি। দুটো মাত্র ওয়ার্ড—এন. এস.।

রমাশঙ্করবাবু বললেন,—এন. এস.। কার নাম। সংগ্রাম সিং হলে হত এস. এস.। কিংবা ডাক্তার হলে হত পি. এস. কে.। মানে প্রেমসাগর খাণ্ডেলওয়ালা। এন. এস. বলে ওদের দলে কেউ নেই তো?

প্রফেসর সেন হেসে বললেন,—আছে আছে রমাশঙ্করবাবু। এই এন. এস. সেদিন মাঝরাতে আপনাকে প্রথম টেলিফোন করেছিল।

রমাশঙ্করবাবু চমকে ওঠেন,—ও ইয়েস। নীনা সরখেল।

—দ্যাট্‌স্ রাইট। নীনা সরখেল। সংগ্রাম সিং অতি চালাক কিনা তাই নীনা সরখেলের ঠিকানাটা ব্যবহার করছে।

রমাশঙ্করবাবু বললেন,—কিন্তু ঠিকানাটা লক্ষ্য করেছেন। আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে যাওয়াটা যুক্তিযুক্ত হবে কি।

—হয়তো হবে না। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিতেই হয়। আজ রাত্রে আমি একাই যাব।

প্রফেসর সেনের কথার নড়চড় হবার নয়। অসমসাহসী পুরুষ তিনি। কোনরকম বিপদকে তিনি পরোয়া করেন না। তার কিছুটা আভাস রমাশঙ্করবাবু ইতিমধ্যেই পেয়েছিলেন তাই আর তর্ক করলেন না।

ভ্রমর সিং শুধু বললেন,—আপ আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে যানে কা বাদ ম্যাঁ দো ঘণ্টা ইঁহা রহেগা। উসকা অন্দর আপ আয়া তো আচ্ছা হ্যায়। নেহি তো হাম ছোড়েগা নেহী। উধার যায়গা দোচার লাশ গিরাকে চলে আয়গা। আপকো কুছ হুয়া তো হাম সে বুরা কোই নেহী হোগা। ইয়ে বাৎ সোচ্‌কে আপ যাঁহা খুশী যাইয়ে—

ভ্রমর সিংয়ের কথা শেষ হতেই টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। প্রফেসর সেন রিসিভার তুললেন,—হ্যালো প্রফেসর সেন স্পিকিং—

ওপাশ থেকে বামাকণ্ঠে জবাব এল,—নমস্কার প্রফেসর সেন। আমাকে আপনি চিনবেন না। আমার নাম নীনা সরখেল।

(ক্রমশঃ)

ধানবাদ জেলার ওয়েস্ট গোধর কলিয়ারী হইতে শ্রীমতী উমারানী রায় ও শ্রীকালিদাস রায় তাঁদের স্বর্গতা কনিষ্ঠা কন্যা কুমারী রীতা রায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁহাদের প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺কুমারী রীতা রায় স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

জন্ম : ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯
মৃত্যু : ২৭শে জুলাই, ১৯৭১

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু

চিকিৎসক বড় না বিধাতা বড়

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ : ৩০শে মাঘ ১৩৭৮। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী চৈত্র সংখ্যা ১৩৭৮ শুকতারায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার ১৫·০০ টাকা ● **দ্বিতীয় পুরস্কার ১০·০০ টাকা**

হাঁদা ভোঁদার
টেকনিক
কি বসে বসে মাথা মুণ্ডু বই পড়ছিস। চল,ওদিকের মাঠে যে বিরাট মেলা বসেছে সেটা দেখে আসি।
তোকে আর আমার মতো স্মার্ট বানাতে পারলাম। নামের মতো কাজেও তুই ভোঁদা হয়ে থাকলি !
তাই হবে হয়তো !
মেলায়
দেখি কটা নারকেল ফেলে জিতে নিতে পারি — ইস ! একটুর জন্যে ফসকে গেলো রে হাঁদা !
প্রতি বল ১০ পয়সা
দূর ! ওই নারকোলে হিট করা তোর কম্ম নয় ভোঁদা ! দ্যাখ এক বলেই ঠিক লাগিয়ে দিচ্ছি।

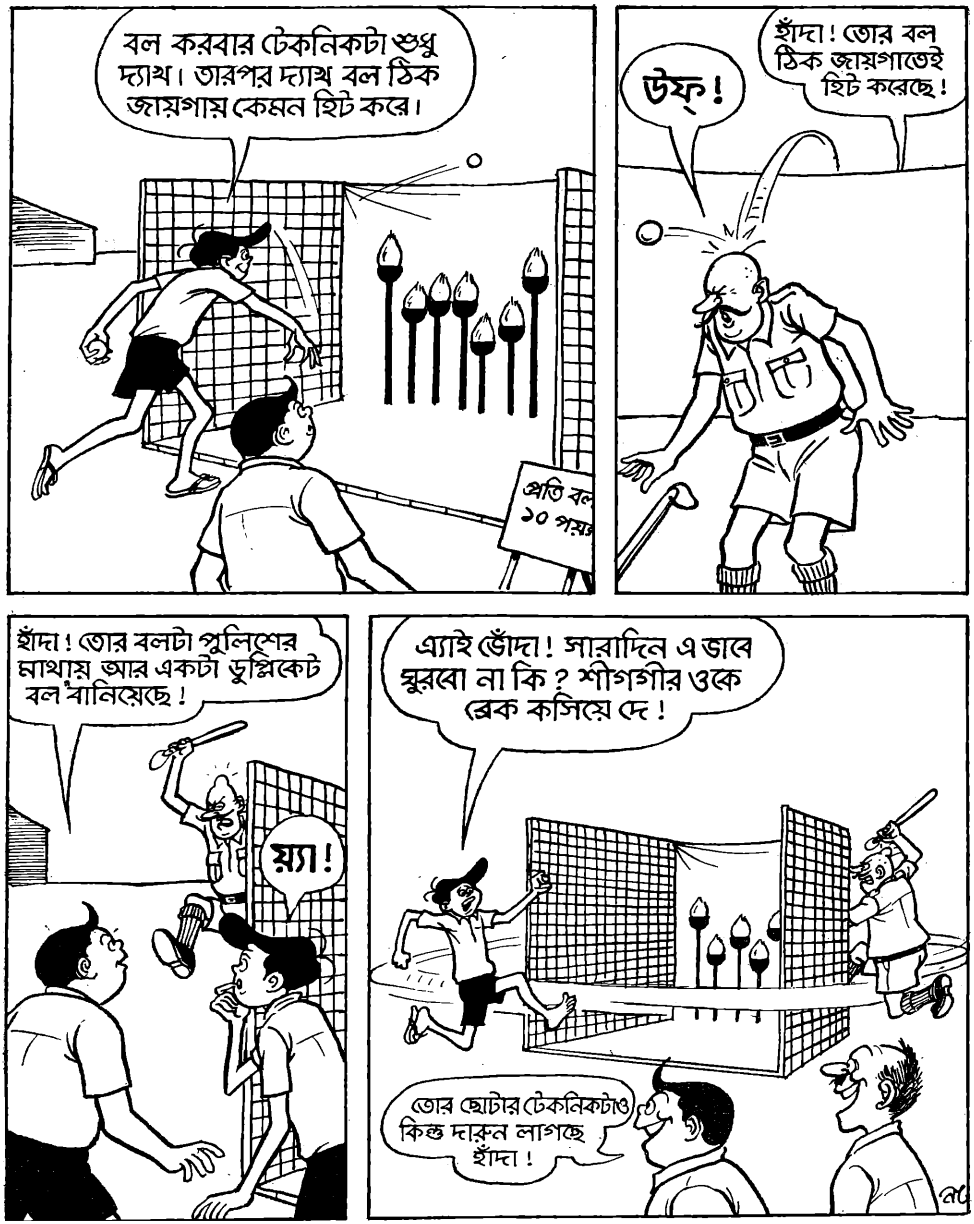
বল করবার টেকনিকটা শুধু দ্যাখ। তারপর দ্যাখ বল ঠিক জায়গায় কেমন হিট করে।
প্রতি বল ১০ পয়
উফ্!
হাঁদা! তোর বল ঠিক জায়গাতেই হিট করেছে!
হাঁদা! তোর বলটা পুলিশের মাথায় আর একটা ডুপ্লিকেট বল বানিয়েছে!
য়্যা!
এ্যাই ভোঁদা! সারাদিন এ ভাবে ঘুরবো না কি? শীগগীর ওকে ব্রেক কসিয়ে দে!
তোর ছোটার টেকনিকটাও কিন্তু দারুন লাগছে হাঁদা!

"বৈশাখী গাইন স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

সান্ত্বনা নেই

বিশন মিত্র

নীলিমা দেবী ঘর আর বার করছেন। দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন আর উৎকণ্ঠায় মন ভরে উঠছে, এত দেরি করছে কেন রজত। পইপই করে বলে দিয়েছেন তিনি তাড়াতাড়ি ফিরতে, তা ছেলের যদি সেদিকে এতটুকু খেয়াল থাকে! পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কি করবেন এখন তা ভেবে স্থির করতে পারেন না। তিনি কি নিজে গিয়ে খোঁজ করবেন? তাছাড়া অন্য কোন উপায় তো দেখতে পাচ্ছেন না। রজতের বাবা অফিসে—তা না হলে তাঁকে ছেলের খোঁজে পাঠানো যেত। ধারে কাছে ছেলেপিলে এমন কাউকে পাচ্ছেন না যে তাকে একটু খোঁজ-খবর করতে পাঠাতে পারেন। সব দুরন্ত ডানপিটে ছেলেমেয়েগুলো এই সময়ে যেন উধাও। কারো টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবে কি তিনি নিজেই বেরোবেন ছেলেকে খুঁজতে।

এত উতলা হবার কি আছে! ছেলে তো তার কচি খোকা নয়। বাইশ তেইশ বছর বয়েস হয়েছে। লেখাপড়া শেষ করে সদ্য চাকরিতে ঢুকেছে। ইংরেজীতে ছেলে এম-এ. পাস, দেশ-বিদেশের কত খবরাখবর রাখে। রামায়ণ-মহাভারতের মত মোটামোটা ইংরেজী বই পড়ে। তার বয়েসী কত ছাত্র এখনো কলেজের গণ্ডী ছাড়াতে পারেনি। আর সে কিনা দিব্যি কলেজে পড়াচ্ছে। এর মধ্যে কলকাতার এক কলেজে প্রফেসর হিসাবে নাম করে ফেলেছে। যে ওকে চেনে না জানে না সে দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না যে ও কলকাতার এক কলেজের প্রফেসর। শুধু তাই নয়, ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। গোঁফ দাড়ি এখনো ভাল করে গজায়নি। তাঁদের শিবরাত্রির সলতে, একমাত্র ছেলে রজত বিন্দুমাত্র পালটায়নি। এখনো সেই পূর্বের মত দুরন্ত, চঞ্চল রয়ে গেছে। গ্রীষ্মের ছুটিতে তাঁদের কাছে ছুটি কাটাতে এসেছে। তা দেখতে দেখতে দিন দশ-বারো কেটে গেল। এই দশ-বারো দিনের মধ্যে রাতে ক-ঘণ্টা ঘুমোন ছাড়া আর তাকে ঘরে পাওয়া ভার। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কোথায় কোথায় যে হৈচৈ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার ঠিকানা মেলা দুষ্কর। এমন বারমুখো ছেলেকে নিয়ে তাঁর হয়েছে যত জ্বালা। দুদণ্ড যদি ঘরে থাকে। রোজ রোজ ছেলের জন্যে কত কি নতুন নতুন খাবার বানান, নতুন

স্বাদে—রান্না করেন, যাতে মেসে হোটেলে খাওয়া ছেলে দুদিন ভালমন্দ খেয়ে মুখ পালটাতে পারে।

আজ এখনো খেতে এলো না কেন, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে অথচ ছেলের পাত্তা নেই। আড্ডা দিতে দিতে ক্ষিধে-তেষ্টা সব ভুলে গেল নাকি। কিন্তু অন্য দিন তো এমন করে না! খাবার সময় ঠিক ঘরে এসে স্নান-আহার সেরে আবার বেরিয়ে পড়ে। গতকাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তিনি ছেলেকে আর বেরোতে দেননি, ছেলেকে ঘরে আটকে রাখার উদ্দেশ্যে শুয়ে শুয়ে কলকাতার গল্প শুনছিলেন ছেলের মুখ থেকে। রজত কিন্তু বাইরে বেরোবার জন্যে উসখুস করছিল, নীলিমা দেবী তা বুঝতে পেরে নিজেও এই মফস্বল শহরের ভালমন্দ গল্প বলে যাচ্ছিলেন যাতে বেরোবার ফুরসত না পায়। গল্প বলতে বলতে কখন তিনি নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছেন জানেন না। অনেক পরে যখন তাঁর ঘুম ভাঙ্গল তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে। ঘড়িটার দিকে নজর পড়তে দেখলেন পৌনে পাঁচটা। রজতের বাবা সৌমেনবাবুর অফিস থেকে ফিরবার সময় হয়ে আসছে। ছেলে পাশে নেই। হাওয়া। পরে ছেলেকে জিজ্ঞেস করে জেনেছিলেন যে তিনি ঘুমিয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে রজত সরে পড়েছিল—ঘর ছেড়ে একদম বাইরে, ছেলেকে ধরে রাখতে গিয়ে নিজেই ছেলের কাছে বোকা বনে গেছেন।

দুপুর তিনটে কখন বেজে গেছে, এখন চারটে বাজতে যায়, আর তো নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা যায় না, ওর বাবার অফিস থেকে ফিরতে এখনো দেরি আছে। এতক্ষণ কি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করবে! ওর বাপ ফিরলে ছেলের খোঁজে পাঠাবে। নীলিমা দেবী স্বামীর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করতে পারলেন না। দরজায় তালা লাগিয়ে নিজেই ছেলের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজ করলেন তবু ছেলের কোন হদিস মিলল না। তখন নীলিমা দেবীর মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। অমূলক আশঙ্কাই দেখছেন এখন সত্যে পরিণত হলো। রজতের যে সব বন্ধুর বাড়ি তিনি সন্ধান করলেন তারা সবাই বলল যে রজত তো তাদের কাছে আড্ডা দিতে আসে না। রজতের মত ছেলে তাদের কাছে এলে তারা তো বর্তে যায়। কিন্তু তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না তবে রজত বাড়ি থাকে না কেন। কোথায় সারাদিন আর রাতের কিয়দংশ কাটায়! তবে কি ছেলে তাঁর গোপনে কোন অন্যায় কাজ করে বেড়াচ্ছে তাঁদের দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে! আজ আসুক রজত ঘরে তারপর এর একটা ফয়সালা হবে। অল্প বয়েসে স্বাবলম্বী হয়েছে বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে! আজ যে সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, উচ্চ শিক্ষিত বলে সমাজে তার মাথা উঁচু হয়েছে তার পিছনে তাঁদের কত

কষ্ট, কত অর্থব্যয়, কত উৎকণ্ঠা, কত উদ্বেগ লুকিয়ে আছে তা কি ছেলের একবারের জন্যে মনে আসে না। উদয়াস্ত কলম পিষে উনি জান কয়লা করে ফেললেন, ছেলেকে মানুষ করে তুলতে শখ, সাধ, আহ্লাদ সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে এলেন, আজ কিনা তারই সন্তান বাপের দুঃখ-কষ্ট বুঝেও বুঝছে না। মায়ের দিকে মুখ তুলে চাইছে না। রজত তাঁদের তেমন ছেলে নয়। মা বাপের দুঃখকষ্ট সে ভালভাবেই বোঝে। বাপকে সে দোকানে খাতা লেখার চাকরি ছেড়ে দিতে বলেছে। সংসারের যাবতীয় খরচ সেই চালাবে। আর তাঁকে সে বলেছে আর মাস পাঁচ ছয়েকের মধ্যে কলকাতায় একটা ছিমছাম পছন্দসই বাসা ভাড়া নিয়ে তাঁদের সেখানে নিয়ে যাবে। অল্প ভাড়ার এঁদো ঘরে তার মা-বাবা কষ্ট করবে আর সে দিব্যি স্ফূর্তিতে দিন কাটাবে তা হতে দেবে না।

নীলিমা দেবী নিজেও রজতকে ভালভাবেই জানেন। এমন ছেলে বাপ-মায়ের গর্ব। এতদিন কষ্ট করে এসে এবার তাঁরা সুদিনের মুখ দেখতে আরম্ভ করেছেন। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে নীলিমা দেবী মফঃস্বল শহর ছাড়িয়ে গ্রামের মধ্যে কখন এসে পড়েছেন খেয়াল করেননি। সূর্য অস্ত গেছে। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। সম্বিত ফিরে পেয়ে তিনি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। ওর বাপ এতক্ষণ ফিরে এসেছে নির্ঘাত। ঘর বন্ধ দেখে কি ভাবছে। হয়তো দোকানে গিয়ে চা খেয়ে নেবে। ছেলেটার জন্যে তিনি কি এক কেলেঙ্কারী কাজ করে বসলেন। তাছাড়া এর মধ্যে রজত যদি ফিরে আসে ঘরে!

ঘর বন্ধ দেখে সেও বা কি ভাববে। দুপুরে খাওয়া হয়নি—খিদেও পেয়েছে সেই রকম। এই অবস্থায় সে কোথায় যাবে! না এবার ফেরা যাক। এতদূর তো এলাম, কোথাও যখন দেখতে পাওয়া গেল না তখন আর এদিকে নেই।

ফিরেই আসছিলেন তিনি। এমন সময় অদূরে আকাশ লালে লাল করে আগুনের লেলিহান শিখা উঠতে দেখে তিনি চলে যেতে পারলেন না। গ্রামের যেদিকে আগুন লেগেছিল সেদিকে পা চালালেন। কাছাকাছি গিয়ে দেখলেন পাশাপাশি খান কয়েক কুঁড়েঘর দাউদাউ করে জ্বলছে। স্থানীয় বাসিন্দা ক্রন্দনরতা এক ভদ্রমহিলাকে আগুন লাগার কারণ জিজ্ঞেস করতে তিনি হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'দুঃখের কথা কি আর বলব—রজত নামে একটা ছেলে রোজ আমাদের গ্রামে নিরক্ষরদের লেখাপড়া শেখাতে আসতো। অন্যদিনের মত সে আজও গ্রামের ছোট ছোট গরিব ঘরের ছেলে-মেয়েদের পড়াচ্ছিল, এর জন্যে সে একপয়সাও নেয় না। জোর করলে বলে, আমাকে মাস্টারি করার জন্যে যে পয়সা দিতে চান ঐ অর্থ দিয়ে ওদের টিফিনের ব্যবস্থা করতে

পারেন তো দিব্যি। কি আর করবো বলুন। অমন সোনারচাঁদ ছেলে না হলে অমন সুন্দর কথা বেরোয়। তাই করতে হয়। না হলে যে রজত মাস্টার রাগ করবে। নীলিমা দেবী জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা রজত নামে ছেলেটি কতদিন ধরে এখানে পড়াতে আসছে? তা কিছু বলতে পারেন?' ভদ্রমহিলার নাম মন্দিরা। তিনি বললেন, 'বেশী দিন না, এইতো দিন আট দশ ধরে আসছে। শুনেছি এখন নাকি ছেলেটা কলকাতার কোন এক কলেজে প্রফেসরি করে। এই গ্রামে ওর অনেক বন্ধুবান্ধবও আছে। প্রথম দু' একদিন তাদের কাছেই আসত দেখা-

জ্বলন্ত ঘরের চাল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। [পৃষ্ঠা ৮৪৬

সাক্ষাৎ করতে। যখন শুনল আমাদের এই গ্রামে কোন স্কুল পাঠশালা নেই, ছেলে-মেয়েগুলো পড়াশুনা না করার ফলে বয়ে যাচ্ছে, তখন বন্ধুদের সাহায্যে আমার একখানা ঘর নিয়ে ক্লাস খুলে বসেছে। গ্রামের যত ছেলেমেয়েরা রজত মাস্টারের কাছে লেখাপড়া শিখতে আসে। পড়াতে পড়াতে দুপুর গড়িয়ে যায়, কত অনুরোধ করি চারটি খেয়ে যেতে, তা ছেলে কিছুতেই রাজী হয় না। আজ হয়েছে কি ডাল সাঁতলাবো বলে কড়ায় তেল দিয়েছি। কোথেকে কি হলো বুঝতে পরলাম না হঠাৎ কড়ার তেল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। জল ঢেলে আগুন নেভানোর ফুরসত পেলাম না, তার আগেই রান্নাঘরের খড়ের চালে আগুন ধরে গেল। এত অল্প সময়ের মধ্যে কাণ্ডটা ঘটে গেল যে আমি নিজেই হতভম্ব হয়ে গেলাম। ছুটে গিয়ে সকলকে খবর দেবার আগেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল। এখানে তো আর দমকলের অফিস নেই যে খবর দিলে দৌড়ে এসে আগুন নিভিয়ে ফেলবে। পাড়ার ছেলে ছোকরারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে

আগুন আয়ত্তে আনতে। গ্রীষ্মকাল, পুকুরেও বেশী জল নেই।' কথা বলতে গিয়ে মন্দিরা দেবীর কান্না থেমে গিয়েছিল কখন তিনি নিজেও জানেন না।

চোখ ছাপিয়ে আবার অশ্রুর বন্যা নামল মন্দিরা দেবীর। 'আর কি বলব প্রাণের ভয়ে নিজে পড়িমরি করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। ছোট ছেলেটা যে ঘরে খেলা করছিল তার কথা একদম মনে ছিল না। রাক্ষসী আমি, তা না হলে অবোধ নিষ্পাপ শিশুকে আগুনের মুখে ছেড়ে দিয়ে আসি!' নীলিমা দেবী বললেন, 'আপনার কি দোষ—আপনি তো ইচ্ছে করে ছেলেকে ফেলে আসেননি। ঘর তো দাউ দাউ করে জ্বলছে, ছেলে এখন কোথায়? কেউ ঘর থেকে বের করে আনেনি? আর আমার রজত কোথায়? তাকে দেখছি না কেন? সেকি আগুন নেভাচ্ছে? বলুন না চুপ করে আছেন কেন—আমার রজতকে দেখেছেন?' মন্দিরা দেবী ক্রন্দন বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'রজত তাহলে আপনার ছেলে? আপনিই সোনার চাঁদের মা? কি ভাগ্য আপনার দর্শন পেলাম, আমার তিন বছরের শিশুকে অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করতে আপনার হীরের টুকরো ছেলে কারোর বাধা নিষেধ কানে না নিয়ে প্রাণকে তুচ্ছ করে এই জ্বলন্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। জানেন গ্রামে এত ছেলেছোকরা আছে কিন্তু বিপদের মুখে সবাই পিছিয়ে গেল। আমার মৃত্যুমুখে পতিত ছেলেকে কেউ বাঁচাতে এগিয়ে গেল না। আপনার নির্ভীক নিঃস্বার্থপর পরোপকারী ছেলে কারোর অনুরোধ উপরোধের তোয়াক্কা না করে নিজেই ছুটে গেছে আমার ছেলেকে যমের মুখ থেকে ছিনিয়ে আনতে। আপনি ভাববেন না দিদি আপনার ছেলে ঠিক ফিরে আসবে আমার ছেলেকে নিয়ে।'

কথা শেষ হতে না হতে জ্বলন্ত ঘরের চাল হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। অগ্নিকুণ্ড থেকে কাউকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল না। মন্দিরা দেবী অবুঝ অবোধ শিশুপুত্রের মৃত্যু-যন্ত্রণা যেন আপন অন্তরে অনুভব করলেন। আর নীলিমা দেবী রজতের মত সুপুত্রকে হারিয়ে পাথর হয়ে গেলেন। দুটি মাতৃহৃদয় অব্যক্ত বেদনায় জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছিল। তবে নীলিমা দেবীর দুঃখ, শোক ছিল আরো গভীর, আরো বেদনাদায়ক। কারণ অনেক দুঃখ কষ্ট সয়ে নিজের হাতে মানুষ করা, স্বাবলম্বী করে তোলা ছেলেকে নিয়তির হাতে সঁপে দিতে কি যে দুঃখ বেদনা প্রাণে জাগে তার পরিমাপ করার সাধ্য কারোর নেই—তা সে যত বড় কবি বা সাহিত্যিক হোক না কেন। নীলিমা দেবীর শোকে তাই সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাওয়া যায় না, মনুষ্যসৃষ্ট ভাষাও মায়ের শোকে মূক হয়ে যায়।

———

"৺বৈশাখী গাইন স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

রক্তচোষার শিকার

অনুরাধা মুখার্জী

আজ আমি যে কাহিনী লিখতে বসেছি তার একটা কথাও কাল্পনিক নয়। কাহিনীটি আমাদের একান্ত পরিচিত একটি পরিবারকে নিয়ে। কাহিনীর নায়ক তারাপদ আমাদের সকলেরই পরিচিত। ভারী সুন্দর দেখতে। লম্বায় প্রায় সাড়ে ছ'ফুট। তিনি যখন অফিসের পোশাক পরে ফিরতেন সকলেই তাঁর দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে দেখত। ভদ্রলোক কাজ করতেন কলকাতায় পুলিস ডিপার্টমেণ্টে। চেহারা, আচরণ ও সুমিষ্ট কথাবার্তার জন্যে তারাপদ সাবইনস্‌পেক্টরকে চিনত না এমন কম লোকই ছিল না অফিসে। বাড়িতে ছিল স্ত্রী আর দুটি ছেলে। বড় ছেলেটির বয়স এগারো আর ছোটটির ছয়। এই চারজনকে নিয়েই ছিল এদের ছোট্ট সংসার। সম্প্রতি একজন বেড়েছে। এক সপ্তাহ আগে ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ পিতা পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক হাঙ্গামায় ভিটেমাটি ছেড়ে এসে ছেলের সংসারে আশ্রয় নিয়েছেন।

তারাপদ দত্ত ছিলেন পুলিসের Special Branch-এ। রোজ দশটা পাঁচটা office করে বাড়ি ফিরে আসতেন। ইদানীং বাড়ি ফিরে আর কোথাও বেরুতেন না। সংসারের বাকী সব প্রয়োজনীয় কাজ, যেমন বাজার করা, দুধ আনা, দোকানে যাওয়া ইত্যাদি সব সারতেন তাঁর স্ত্রী।

একদিন সকাল দশটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া সেরে তারাপদবাবু Office যাত্রা করেছেন। বাড়িতে তখনও তাঁর এঁটো থালা পড়ে রয়েছে। স্বামীকে অফিসে পাঠিয়ে তাঁর স্ত্রী বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবার ব্যবস্থা করছেন। মনের মধ্যে ইদানীং তাঁর সদাই একটা উদ্বেগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠত স্বামী বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে। স্বামী ফিরে না আসা অবধি কিছুতেই সোয়াস্তি পেতেন না। সেই উদ্বেগই কি তার কাল হল? তিনি কি পাগল হয়ে যাবেন? এই সব ভাবতে ভাবতে তিনি দৈনন্দিন কাজগুলি সারতে লাগলেন।

সেদিন Office যাবার পথে তারাপদবাবু পেছন থেকে হঠাৎ ডাক শুনতে পেলেন "তারাদা শুনুন।" চকিতে ফিরেই দেখলেন পাড়ার দুর্দান্ত মস্তান, সারা বর্তমানে সমাজবিরোধী নামে পরিচিত, তেমন কয়েকটি সশস্ত্র ছেলেকে। অভ্যাসবশতঃ কোমরে হাত দিয়ে রিভলবার খুঁজতে গিয়েই মনে পড়ল যে সরকারী আইন অনুযায়ী

তারাপদ বড় রাস্তার দিকে ছুটতে লাগলেন।

রিভলবার ছিনতাই হলে সাসপেণ্ড হতে হবে এই ভয়ে রিভলবারটা কয়েকদিন আগে তিনি থানায় জমা দিয়ে দিয়েছেন। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে তিনি প্রাণ বাঁচাতে ছুটতে আরম্ভ করলেন। কারণ সমাজবিরোধীদের হাতে নিহত পূর্বের কয়েকজন পুলিস কর্মচারীর শোচনীয় মৃত্যুর কথা স্মরণ করে তিনি আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। এদিকে অন্যান্য পথচারীরা তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে যাওয়া দূরে থাক দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল কি এর পরিণতি। এদিকে তারাপদবাবু ছুটতে ছুটতে সামনে একটি চটের কারখানা দেখে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে আত্মরক্ষার উপায় খুজলেন। কিন্তু পেছনে কয়েকটি সশস্ত্র ছেলেকে ছুটে আসতে দেখে কারখানার লোকেরা নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁকে ঢুকতে দিল না। তিনি আবার বড়রাস্তার দিকে ছুটতে লাগলেন। এই সময় দুপায়ে দুটো গুলি এসে লাগল। তিনি তা সত্ত্বেও ছুটতে লাগলেন। এবার গুলি লাগল কোমরে ও পিঠে। আর পারলেন না। সাড়ে ছ'ফুট দেহটা নিয়ে রাস্তার মধ্যে তারাপদবাবু উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রক্তচোষা অক্টোপাসের দল। পিঠে বুকে পড়ল সুতীক্ষ্ণ ছুরির ফলা। ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেতে লাগল সারা শরীর। দুটো হাতই কনুই থেকে কেটে বাদ দিয়ে দিলে সমাজবিরোধী গুণ্ডারা। তারপর দানবেরা চলে যেতে একজন দৌড়ে গিয়ে খবর দিল যে তারাপদবাবু এইভাবে খুন হয়েছেন। শুনেই তাঁর স্ত্রী পাগলের মতো দৌড়ে বেরুলেন। ভদ্রলোকের জীবনীশক্তি এত বেশী ছিল যে তাঁর স্ত্রী ছুটে গিয়ে তাঁর পাশে বসে তাঁর মাথা চেপে ধরার পরেও তিনি চোখ মেলে চেয়েছেন। কিছু বলতে চেয়েছেন, কিন্তু হায় গলায় স্বর ফোটেনি। বড় রাস্তা তখন জনমানবশূন্য। কারণ প্রতিটি গলির মুখে ঐ রক্তপিশাচদের দলই দাঁড়িয়ে থেকে লোকজনকে আসার পথে বাধা দিচ্ছিল।

যাহোক তারপর ভদ্রলোককে আর. জি. কর হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

একটা ৩৬ বৎসরের সুস্থ সবল জীবন শেষ হয়ে গেল। সত্যি আজকের এই অবস্থার কি কোন বিচার নেই। কত সংসারের অবলম্বন কত সংসারের একমাত্র আশা এইভাবে বিনষ্ট হচ্ছে তার কি কোন প্রতিকারই নেই। মানুষের বুকভাঙ্গা কান্না কি নিষ্ফল। তাদের কোন আবেদনই কি ভগবানের কাছে পৌঁছয় না। আজকের দিনে মানুষের জীবন যেন একটা খেলার সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানুষ হত্যা যেন এখন সামান্য একটা মুরগী জবাই-এর পর্যায়ভুক্ত। ভগবানের রাজ্যে এর কি কোন দণ্ডই নেই! হয়তো দণ্ডদাতা বিধাতা পাপের পূর্ণ হওয়া অবধি তাঁর দণ্ড নিয়ে অপেক্ষা করবেন। তার আগেই অসুরদের হাতে বহু নিরীহ দেশবাসী প্রাণ হারাবে।

সবচেয়ে বেদনাময় পরিণতি হল তারাপদবাবুর বৃদ্ধ পিতার। তিনি এখন বদ্ধ উন্মাদ। সব সময় বড় রাস্তার ধারে একটা জলের বালতি হাতে নিয়ে যেখানে তারাপদবাবু নিহত হন সেই জায়গায় জল ঢালেন আর পথচারীর কাছে করুণ মিনতি করেন, "ওরে তোরা সর, তোরা আমার ছেলের রক্ত মাড়াসনে।" জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে বৃদ্ধ পিতার এই শোচনীয় পরিণতি এবং একটা অবলম্বনহীন সংসারের অসহায় অবস্থার জন্য দায়ী কে?

হয়তো এ আমাদেরই ভুলের ফল। লোভের বশে আমরাই কি শয়তানদের মাথায় তুলেছিলুম বলে এই অত্যাচারের মাসুল দিচ্ছি? আগামী কালেই হয়তো এর উত্তর পাওয়া যাবে।

———

জরুরী ঘোষণা

এতদ্দ্বারা "শুকতারা"র পাঠক-পাঠিকাদের এবং এজেণ্টদের জানানো যাইতেছে যে, কাগজের মূল্য এবং ছাপা খরচ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় আগামী পৌষ মাস স্থলে ফাল্গুন মাস (১৩৭৮) হইতে "শুকতারা"র দাম ·৭০ পয়সার স্থলে ·৮০ পয়সা হইবে।

* * গ্রাহকদের আরও জানানো যাইতেছে যে, আগামী ফাল্গুন, ১৩৭৮ সাল হইতে শুকতারা বার্ষিক চাঁদা সডাক ৮ টাকা এবং ষাণ্মাসিক চাঁদা সডাক ৪ টাকা হইবে।

যাঁহারা গ্রাহক হইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শুকতারা কার্যালয়ে টাকা পাঠাবেন।

—শুকতারা সম্পাদক

মজার পাতা

নতুন ধাঁধা

১। যথা খুশী তথা যাও মাথা দিয়ে চলি
মাথা বাদ লেজটি আমি তোমায় খেতে বলি। — শ্রীকান্ত মাহাতো, কোকপাড়া।

২। মার খাবি তো খা,
মাঠ থেকে তুলে এনে রাখবি সেথায় যা। — পুণ্ডরীকাক্ষ হাজরা, ছড়রা।

৩। সদরেতে পাবে না, পাবে তারে নিভৃতে,
লেজহীন বর্ণ পাবে, পশু সব আগেতে! — শ্যামাপ্রসাদ দাস, কয়াপাট।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। নীরব। ২। আপদ। ৩। ছটাক।

গত মাসের ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—লিলি, জীবানন্দ, নবীন, পরমানন্দ ও রূপা পাল—কড়েয়া রোড; দিলীপকুমার ধর—ইস্ট বেলঘরিয়া; রত্না, মিতা ও পম্পা—যাদবপুর; মাধু, জগু তপু, বিচ্ছু, বেবী ও মেইডা—হালদার পাড়া রোড; পরেশ, নরেশ, সন্তোষ, অমল ও সন্দীপ রায় জামির লেন; আশীষ, অনিতা, রীতা, সজল, ছোটমামা ও ছোট-মাসী—যাদবপুর; চন্দ্রাবলী, নন্দিনী, শ্রবণা, সাগরনীল, ইন্দ্রনীল ও রূপা গুপ্ত—নাকতলা; সাম, মনা, তৃপ্তি, টুকু, বীণা ও শ্যামল—গাহাম রোড।

২৪ পরগনা—বাপী, জয়শ্রী, দেবাশীষ ও ত্রিলোচন ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; জয়দেব, শুকদেব, বাসদেব ও সোমা সরকার—ছোট বাঁকড়া; মৌসুমী, পার্থ, চৈতালী ও মিতালী বসু—বারাসত; চিত্রশ্রী ও বিশ্বজিৎ ব্যানার্জী—ইছাপুর; বাপী তুলতুল, বাবুন ও শান্টু—কাঁচরাপাড়া; অমিত, সুমিত, বরুণা ও তথাগত ভট্টাচার্য—ভাটপাড়া; শ্যামলী ও অরুণ কর্মকার—খড়দহ; সীমা ও মুকুল চ্যাটার্জী—কালিকাপুর।

হাওড়া—ব্রতীত রায়—উমেশ ব্যানার্জী লেন; মা, অমিতাভ ও অরুণাভ সান্যাল—হাওড়া-৩; সুব্রত, দেবব্রত, ধীরা, সুপ্তা, বাবু ও বাপি—ভট্টাচার্য পাড়া লেন।

হুগলী—মানসকুমার ও মিতালী লাহা—শ্রীরামপুর; সৌগত, উৎসা শুক্লা শুভ্রা, গৌতম ও অমিয় সেনগুপ্ত—উত্তরপাড়া; তাপস আশিষ মিতালী, কাজল, সোনামণি, আলো ও মিহির রায় চৌধুরী—তারকেশ্বর; সমীর, সলিল, মঞ্জু, ছন্দা ও সীমা বসু বৈদ্যবাটী; বাবলু, মনা, বাপি, রমাপিসী প্রভৃতি—শ্রীরামপুর।

নদীয়া—সুস্মিতা ও সুদীপ্ত মাইতি—কল্যাণী।

বর্ধমান—কবিতা, মালা, ময়না, বদু এবং অনুপ মুখার্জী—পিলখানা লেন; জীতু, চন্দন, খুকু ও মিঠু—রামকৃষ্ণ পল্লী; বাবা মা, দাদা, রেণুকা ও সুব্রত কর্মকার—বার্নপুর; তৃপ্তি, বীণা, পামেলা, সীমা, কুমকুম ও বাবা—বার্নপুর; অজিত, অরুণ অসিত ও অসীম মুদী—সাঁতা; মধুছন্দা মুখার্জী—কুলটি; অভয়, ও পার্বতী রায়—আর. বি. ঘোষ রোড; শ্যামল, রবিলাল, শেখর ও রুবি—আসানসোল; দিলীপ, অমর, সৌরেন, তপন, বাপী প্রভৃতি—মেমারী।

মেদিনীপুর—পৃথ্বীশ, পম্প, সিমু ও রণেন্দ্রমোহন—খড়্গপুর; অমিত, সুজিত, পানু, গোপু, শান্তি, সুনীত ও বাসবী—মহিষাদল; দেবু, তুলসী, হরি, দুর্গা, শিবু ও বৌদি—পাটনাবাজার; লীনা, রীণা, রত্না ও অসিত—নন্দীগ্রাম।

পুরুলিয়া—পার্থপ্রতিম ও দীপ্তিমান মাজী—ঝাঁপড়া; পুণ্ডরীকাক্ষ ও তপেশ হাজরা—ছড়রা; বিধান-চন্দ্র মাজী—ঝাপড়া; তন্ময় ও চিন্ময়—মধুতটি।

বীরভূম—মঞ্জুষা ও পার্থ মুখার্জী—সাঁইথিয়া।

বাঁকুড়া—বাপী, মণি, টটুল ও সচ্চিদানন্দ রায়—খাতরা; প্রশান্ত ও জয়দেব শীট—?; চৈতালী ও অভীক দে—বিষ্ণুপুর।

জলপাইগুড়ি প্রদীপ, তপতী, আশীষ ও তপন রায়—আদরপাড়া।

বিহার—সুব্রত ও সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—হিনু; কৃষ্ণকমল, নীলোৎপল, সুকল্যাণী, অপরাজিতা ও ফাল্গুনী মল্লিক—ধানবাদ; টুটু, শ্যামল, গৌতম, বুবু ও সানু—দুগ্দা; অসিতকুমার মন্দী—মিহিজাম; প্রতিভা, তনুশ্রী, রুবেন ও বনশ্রী করগুপ্ত—জামসেদপুর-৩।

মধ্যপ্রদেশ—গোপাল, খোকন, রীণা ও খোকা—বিলাসপুর; সুধীর, জ্যোতি, মা, দীপ্তি, উৎপল, জয়ন্ত ও প্রশান্ত—রায়পুর।

দিল্লী—অমিতজ্যোতি সেনগুপ্ত—মরিসনগর।

ট্যাবী
বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপে
ট্যাবী এসেছে বক্সিং চ্যাম্পিয়ানশিপে উৎসাহ যোগাতে তার বন্ধু—চ্যালেঞ্জারকে!
নিশ্চয় জিতবে আজ
ধন্যবাদ, ট্যাবী!
রাউণ্ড-১
"লড়াই চলছে...চ্যাম্পিয়ান ক'ষে লাগিয়েছে দুই ঘুষি—একটা ডাইনে আর একটা বাঁয়ে..."
ভীষণ থকে গেছি...জানি না আমার সব শক্তি কোথায় গেলো।
রাউণ্ড-২
"দু'টো মোক্ষম ঘুষি বসিয়েছে...চ্যাম্পিয়ান সত্যিই গুঁড়িয়ে দিচ্ছে চ্যালেঞ্জারকে।"
চ্যালেঞ্জারকে আমার সাহায্য করতেই হবে!
শিগ্গীর কয়েকটা এনার্জী ট্যাব্ খেয়ে নাও।
রাউণ্ড-৩
"অবাক কাণ্ড! হঠাৎ চ্যালেঞ্জার এতো শক্তি পেলো কোথা থেকে? চ্যাম্পিয়ানকে সে ঘায়েল ক'রে দিচ্ছে।"
"একটি ঘুষি ডাইনে...একটি বাঁয়ে তারপর হুক, ব্যস! চ্যাম্পিয়ান কুপোকাত। কী দারুণ ফিনিশ!"
"ইনি...আমাদের নতুন চ্যাম্পিয়ান।"
সুস্বাদু কমলালেবু আর আনারসের স্বাদগন্ধ!
এনার্জী ট্যাবস্
ক্লান্তি দূর করে সঙ্গে সঙ্গে
dCP/GLT/4n ben

ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে...

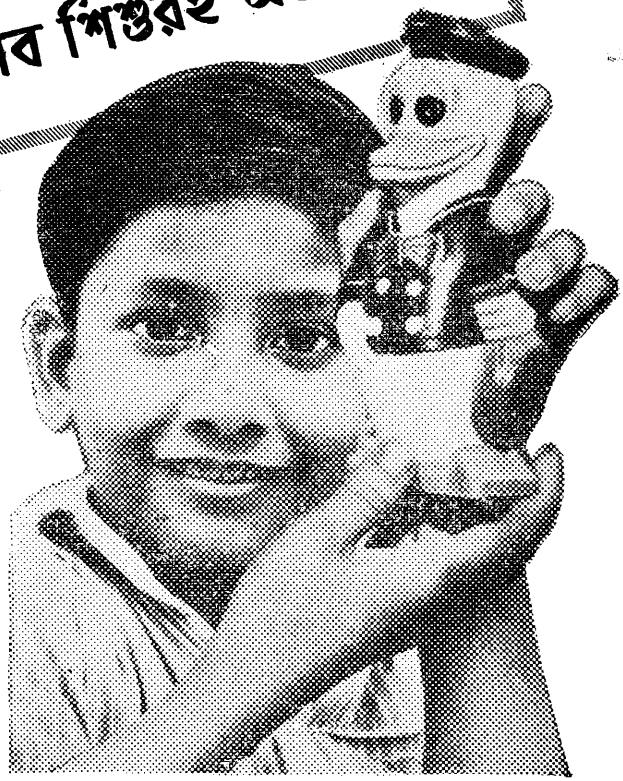

বাচ্চাদের কাছে পয়সা জমানো একটা মজার খেলা। 'ডিজনী পদ্ধতিতে' হাসতে হাসতে পয়সা জমানো যায়। চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অর্গানাইজেশনে এদের জন্য ডিজনী সেভিংস অ্যাকাউন্ট আছে; খেলার মধ্যে কখন যে এতে পয়সা জমে যায়—তারা টেরও পায় না।

আপনার বাচ্চার জন্যে মাত্র ৫৲ টাকা দিয়ে একটা ডিজনী সেভিংস অ্যাকাউন্ট খুলে দিন। এতে বিনা-মূল্যে আপনার বাচ্চাকে দেওয়া হবে একটি মজাদার ডোনাল্ড ডাক মানি বক্স। প্রতিদিন দু' এক পয়সা এতেই ফেলে রাখবে আপনার বাচ্চা। দেখবেন, কী খুশিই না হবে যখন দেখবে নিজেও যেমন বড় হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে তার জমানো পয়সাও বেড়ে চলেছে।

আমাদের যে কোনো ব্রাঞ্চে চলে আসুন। বাচ্চাদের এই মজাদার নতুন পদ্ধতির বিষয়ে বিশদ বিবরণ আজই নিয়ে নিন।

দি চার্টার্ড ব্যাঙ্ক

১৮৫৩ সালের চার্টার দ্বারা সীমিত দায়-দায়িত্ব সহ
যুক্তরাজ্যে সমিতি বদ্ধ

অমৃতসর, বোম্বে, কলিকাতা, কালিকট, কোচিন, দিল্লী, কানপুর,
মাদ্রাজ, নিউ দিল্লী, সান্তাজী (ভাস্কো-ডা-গামা)

SEKAI-CB-273 B·A

সুচিত্রা দেবী আজ ঘরের সব কাজ সেরেছেন,
মাকে দেখে এসেছেন, কেনাকাটা করেছেন, এখন অজয়ের
সঙ্গে খেলা আর গল্প করার পালা।

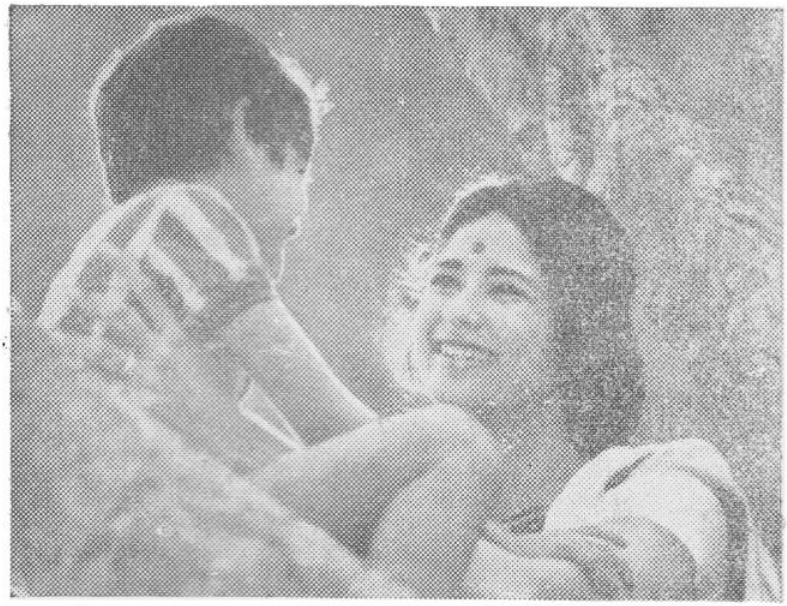

সুচিত্রা দেবী বলেনঃ

"ভাগ্যিস 'হরলিক্স' ছিল—'হরলিক্স' বাড়তি পুষ্টি দেয়
বলেই না এত কাজ করে উঠতে পারি।"

'হরলিক্স' খাঁটি দুধের প্রোটিন আর সুপক্ক গমের পুষ্টিকর সারাংশে ভরপুর।
'হরলিক্স' দৈনন্দিন আহারে পুষ্টির অভাব পূরণ ক'রে প্রতিদিন নতুন উৎসাহ এনে দেয়, শক্তি গড়ে তোলে আর বাড়তি পুষ্টি যোগায়।
'হরলিক্স' পেলে মায়েরা আর কিছু চান না। আর আজ ৮০ বছরের ওপর ডাক্তাররা এটি খেতে নির্দেশ দিয়ে আসছেন।
'হরলিক্স' খান— 'হরলিক্স' পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়। সত্যিকারের পুষ্টি আর বাড়তি শক্তির জন্যে নিন 'হরলিক্স'

HL 2904

'হরলিক্স'—পুষ্টি যোগাতে অতুলনীয়

'হরলিক্স'-রেজিস্টার্ড ট্রেডমার্ক।

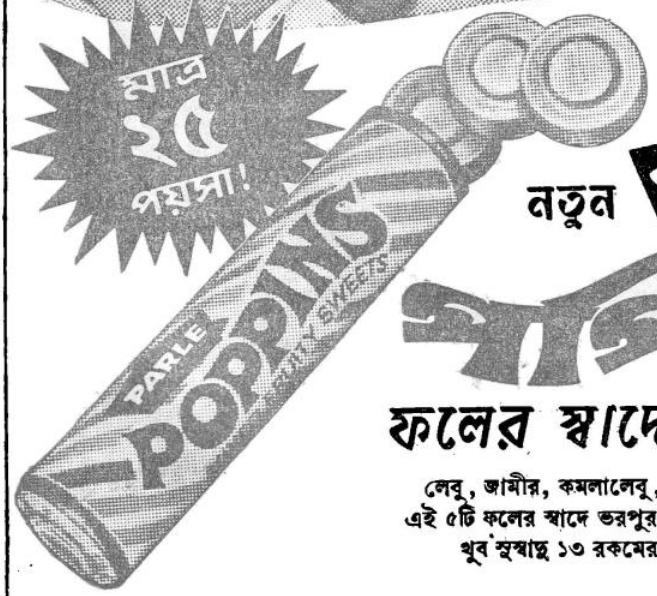

everest/122b/PP ben

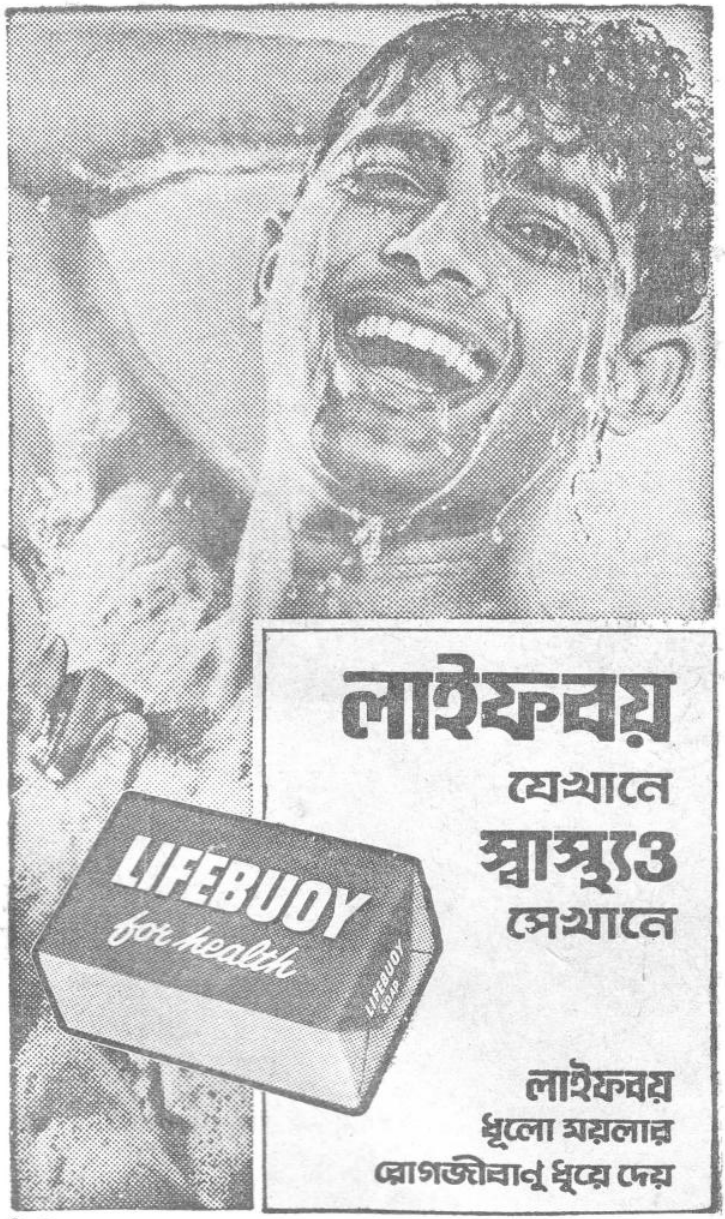

লিনটাস-L. 62-77 BG
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

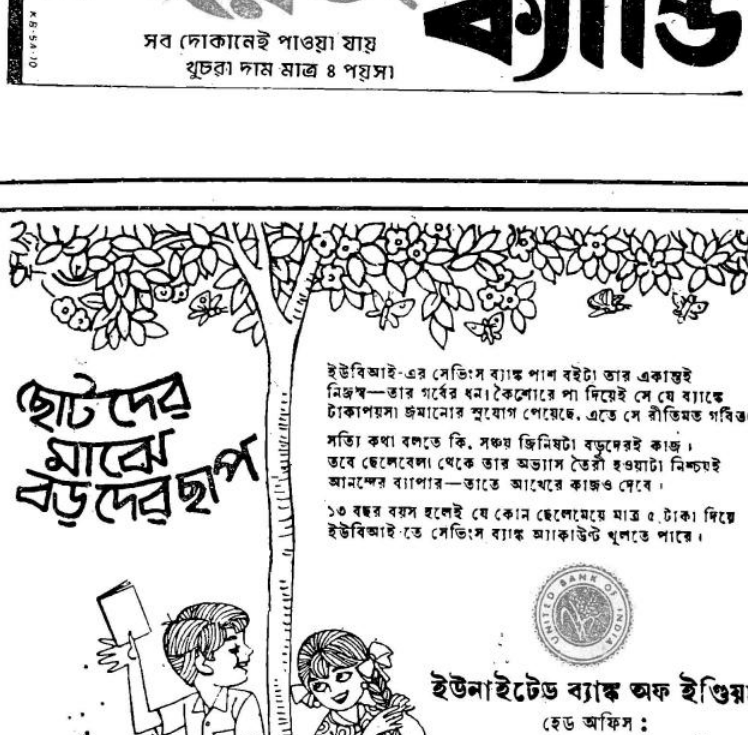

কমলালেবুকেও
হার মানায়
নতুন
কোলে
অরেঞ্জ
ক্যান্ডি
সব দোকানেই পাওয়া যায়
খুচরা দাম মাত্র ৪ পয়সা

ছোটদের মাঝে বড়দের ছাপ
ইউবিআই-এর সেভিংস ব্যাঙ্ক পাশ বইটা তার একান্তই নিজস্ব—তার গর্বের ধন। কৈশোরে পা দিয়েই সে যে ব্যাঙ্কে টাকাপয়সা জমানোর সুযোগ পেয়েছে, এতে সে রীতিমত গর্বিত।
সত্যি কথা বলতে কি, সঞ্চয় জিনিষটা বড়দেরই কাজ। তবে ছেলেবেলা থেকে তার অভ্যাস তৈরী হওয়াটা নিশ্চয়ই আনন্দের ব্যাপার—তাতে আখেরে কাজও দেবে।
১৩ বছর বয়স হলেই যে কোন ছেলেমেয়ে মাত্র ৫ টাকা দিয়ে ইউবিআই-তে সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারে।
UNITED BANK OF INDIA
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া
হেড অফিস :
৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি
কলিকাতা-১
naa/UBI-370